মানুষের মানচিত্র

রমেশচন্দ্র দত্ত

পরিবেশনায় :

ওসমানিয়া লাইব্রেরি
৩০ মদন মোহন বর্মণ স্ট্রীট
কলিকাতা—৭০০০০৭

MANUSHER MANCHITRA

প্রথম প্রকাশ : মাঘ ১৩৭০

প্রাপ্তিস্থান :

বুক মার্ক □ ৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

সাহিত্যশ্রী □ ৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭০০০০৯

আর বি সরকার প্রকাশনী □ ১৯/৭এ পটারী রোড, কলিকাতা-৭০০০১৫

শাখা অফিস : বিবেকানন্দ রোড, খাতড়া, বাঁকুড়া-৭২২১৪০

ইউনিভার্সাল বুক সাপ্লাই □ ১৬ পি সি সরকার স্ট্রিট, কলিকাতা-৭০০০৭৩

১৯৪২ সাল। বিশ্বযুদ্ধ চলছে। ভারত পরাধীন। বঙ্গদেশে মুসলিম লিগের শাসন। ঐ সময়ে প্রধানমন্ত্রী ছিলেন খাজা নাজিমুদ্দিন সাহেব।

যুদ্ধের ধাক্কায় বাজারদর আকাশচুম্বী। তার ওপর শস্যহানি। মন্বন্তর সমগ্র বঙ্গদেশে।

গাছের পাতা খেয়ে লোক বেঁচে থাকার চেষ্টা করছে। গরিবেরা বাড়ি বাড়ি ভাতের ফেন ভিক্ষা করে বেড়াচ্ছে। কয়েকটা বাড়ি ঘুরে একটু ভাতের ফেন পেলে নুন ছিটিয়ে খেতে পারলেও সান্ত্বনা। বুভুক্ষু পীড়িতের দল সরকারি লঙ্গরখানায় বসে চেটেপুটে খাচ্ছে। মানুষে কুকুরে পাতা নিয়ে টানাটানি। শ্মশানের রাজত্ব। শ্মশানের মতই সাম্যবাদী চেহারা। সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ নেই, নেই মানুষে পশুতেও ভেদাভেদ। পেটের জ্বালায় কেউ কারো দিকে তাকায় না। না, পিতা পুত্রের দিকে ; না, পুত্র মাতার দিকে।

এ দৃশ্য আমার নিজের চোখে দেখা। আমি নিজেও বালতি-হাতা নিয়ে সরকারি লঙ্গরখানার খিচুড়ি, বুভুক্ষুদের মধ্যে বিতরণ করেছি। হ্যাংটাপুটে, পুচকে পুচকে বাচ্চাদের শৃঙ্খলার মধ্যে আনা শক্ত। ছেঁড়া শালপাতা হাতে লাইন ভেঙে আমাকে ঘিরে ধরে 'বাবু আমাকে দাও, বাবু আমাকে দাও' বলেই তারস্বরে চিৎকার। হাত ধরে তাদের লাইনে বসিয়ে গরম গরম দু হাতা দিতে হয়েছে। ক্ষুধার যন্ত্রণা তো বটেই, ততোধিক যন্ত্রণা সদ্য-প্রস্তুত ফুটন্ত খিচুড়িকে তিলেকে উদরস্থ করে আরও কিছুটা আদায় করা। হাত জিব পুড়িয়েও অনেক সময় হতাশ হয়ে ঘন ঘন পাতা চেটে পরিষ্কার করতে হয় তাদের, তবুও পেটের জ্বালা মেটে না। কয়েক পাত্র জল ঢেলে পেটটা ভরাট করতে হয়।

ঠিক এমনি দিনে সরকারি লঙ্গরখানার খিচুড়ি পাওয়ার লোভে

কোথা থেকে আসে একটা পরিবার। শীর্ণকায়, অর্ধ উলঙ্গ, তাদের বাচ্চা-কাচ্চা অনেক। পেট মোটা, গলা সরু, পাণ্ডু রোগে আক্রান্ত চলৎশক্তিহীন তারা এক মনুষ্যজাতি, যারা যাযাবরেরও অধম, বন্ধ দরজার ওপিঠ থেকে 'একটু ফেন দাও গো বাবুরা'—সমস্বরে চিৎকার করতে থাকে। আমি তখন অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র। দয়ার্দ্র-হৃদয় কিশোর। বৌদির তাড়া খেয়ে সদর দরজা খুলতে নিরস্ত হই। 'ভিখিরির দল পেটের জ্বালায় হুড়মুড় করে বাড়ি ঢুকবে—এটা ওটা লুকিয়ে নিয়ে পালাবে—কে সামাল দেবে?' বৌদি একরকম গর্জন করে ওঠে। রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে দোতলায় চলে গেলাম। বারান্দা থেকে ঐ লোক-গুলোকে দেখার চেষ্টা করলাম। একবার মনে হল আলনা থেকে কাপড়চোপড় নিয়ে পোঁটলা বেঁধে পিছনের গলিতে ছুঁড়ে ফেলি। তারপর ঐ গরিব লোকদের বলি—কাপড়গুলো নিয়ে শিগ্‌গির সরে পড়ো নইলে খ্যাড়াবৌদি তোমাদের চিবিয়ে খাবে।

কি আর খাবে—ওদের শরীর বলতে কঙ্কালের ওপর চামড়া। বৌদি রাগে পড়ে যদি কিছু ছুঁড়ে মারে তাহলে বিকৃতমস্তিষ্ক বাতিক-গ্রস্ত বৌদিকে গারদে ঢুকতে হবে। যন্ত্রণা কি একটু আধটু!

অনেক চিকিৎসা করেও বৌদিকে সুস্থ করা যায়নি। নেই সন্তানাদি—স্বামীতো নেই-ই। শৈশবেই আমরা আমাদের সবার প্রিয় জ্যাঠতুতো দাদাকে হারিয়েছি—যার কাঁধে চড়ে চুলের মুঠি ধরে ম্যাজিক দেখাতাম। দাদা আদর করে বলত, কাঁধে উঠে ম্যাজিক কর্, আমি ঠিক ধরব। পড়তে দেব না।

সে দাদা পরলোকে। স্বামীহারা বৌদি বিকারগ্রস্ত। মা তাকে সংসারে কর্তৃত্ব করার অধিকার দিয়েছে। যদি সে সুস্থ হয় অথবা শান্তি পায়। সংসারে তার সাত খুন মাফ। আরও দু'একটা বৌ এসেছে সংসারে। কিন্তু খ্যাড়াবৌদি-ই হেডমিস্ট্রেস। ওর শাসন মেনে চলতেই হবে, নইলে আগুন লেগে যাবে। তাই আমাকে তার আদেশ মেনে দরজা খোলা থেকে বিরত হতে হল। অথচ সিং দরজার ওপিঠে

বুভুক্ষুদের চেঁচামেচি হৈ চৈ। 'মা একটু ফেন দাও। ভাতের ফেন মা। আমরা পাঁচজন আছি।'

থাকলে কি হবে, বজ্রকঠিন ন্যাড়াবৌদি শক্ত করে হাল ধরে আছে। সিং দরজায় পিঁপড়ে গলার কায়দা নেই। আমি তখনও দোতলার বারান্দায় পায়চারি করছি।

মা ন্যাড়াবৌদিকে মাথায় তুলেছে, কোন কিছু বলার উপায় নেই। এক সময় মনে হয় বাড়ি ছেড়ে কোথাও চলে যাই। কিন্তু যাব কোথায়? খুঁজে বের করবে ঠিকই, তারপর নতুন করে বৌদির নির্যাতন ভোগ করতে হবে। তাকে খুশি করলে অনেক সময় ভাল কাজ হয়, তা জানা আছে। তেমন সুযোগ হলে বাগান থেকে কাঁচা আমড়া পেড়ে এনে বৌদির হাতে দিতাম। আমড়ার চাট্নি করতো আর কি। বৌদির কাছে ভীষণ প্রিয়। আমড়ার চাট্নি খেয়ে বৌদির মুখের হাপর-টানা চটাস চটাস শব্দে অনেক সময় আঁতকে উঠত বাড়ির ঘুমন্ত কেউ।

হায় ভগবান! তুমিও কম রসিক নও। তোমার চিড়িয়াখানাতে কত কি যে স্থান পায়।

সেদিন মা বুদ্ধি প্রয়োগ করে ন্যাড়াবৌদিকে আয়ত্তে আনল। আনাজের ঝুড়ি থেকে কয়েকটা মোটা মোটা আমড়া বেছে নিয়ে বৌদিকে চাট্নি করতে বলল। বৌদির মনটা পাল্টে গেল। তার মুখ দেখে মা ঝোপ বুঝে কোপ মেরেছিল।

মার আদেশ—'বড় বৌমা, বাবুকে বলো খামার বাড়ির বিচলি গাদার উল্টো দিকে খেতে না-পাওয়া লোকগুলোকে লাইন দিয়ে বসিয়ে দিক, তা নইলে ওরা সব মরে যাবে। দু' মুঠো করে ভাত, দু হাতা ফেন, সামান্য নুন আর দু' তিন টুকরো আলু বরাদ্দ। মোট ক'জন আছে, গুন্তে বলো।' বৌদির চেঁচামেচি শুনে দু' তিনটে করে সিঁড়ি টপ্কে তিন লাফে ন্যাড়াবৌদির পদপ্রান্তে; কি সমাচার? বৌদির জবাব—মা বলছে, না-খাওয়া-লোকগুলোকে খামার বাড়িতে বিচলি গাদার ওপিঠে বসিয়ে দাও। কলার পাতায় দু হাতা ভাত, ফেন, লবণ ও দু' তিন টুকরো আলু দাও, খাওয়া হলে বলে দাও আর যেন না আসে।

একলাফে দৌড়ে গিয়ে সজোরে সিং দরজা খুলে ফেলে না-খাওয়া লোকগুলোকে বললাম, খামার বাড়ি গিয়ে, বিচলি গাদার ওপিঠে বসে যাও। খেতে দেব।

বলার অপেক্ষা রাখে না, কিন্তু তাদের দৌড়বার ক্ষমতা নেই, অনেকদিন অভুক্ত, দুর্বল। শীর্ণকায় বুড়ো-বুড়িকে হাত ধরে নিয়ে যায় পুচ্‌কে পুচ্‌কে বাচ্চাগুলো। সংখ্যায় ওরা কম নয়, প্রায় পঞ্চাশটা পাত। ন্যাড়াবৌদিকে বলতে হবে এক কুড়ি। এর বেশি লোককে দিতে চাইবে না। দূর থেকে মাকে দু'হাত তুলে দশটা আঙুল দেখিয়ে পাঁচবার হাত নাড়ি অর্থাৎ পাঁচদশে পঞ্চাশ জন। মা মুচ্‌কে হেসে ঘাড় নেড়ে বলল, 'ঠিক আছে।'

ন্যাড়াবৌদি রান্না ঘরে ঢুকতো না, কোন কিছু ছুঁতো না—এটাই যা বাঁচোয়া। রাঙাবৌদিকে রান্নাঘরের দায়িত্ব দিয়েছিল মা।

মার ইঙ্গিতে রাঙাবৌদি ভাত, ডাল আর আলু পটলের তরকারি দিল। আমার নির্দেশমত মাধাই নামে আমাদের কৃষাণ পরিবেশন করে এল। ন্যাড়াবৌদি সেখানে যাবে না জানি। কারণ খামার বাড়ি গেলেই তাকে স্নান করতে হবে। খুবই শুচিবাইগ্রস্ত। সকাল ৫টা থেকে রাত্রি ১০টা পর্যন্ত অন্তত ৭/৮ বার তাকে স্নান করতে হয়, না করলে ন্যাড়াবৌদি শান্তি পায় না। কাজের মেয়েরা অর্থাৎ পরি-চারিকারা হাজার কাজ করলেও তার মনঃপূত হয় না। মার নির্দেশ মতই তাদের নিজ নিজ কাজের রুটিন মেনে কাজ করতে হয়। ওপর নিচের সমস্ত ঘর ধোয়া-মোছা, যাবতীয় আসবাব পত্র ঝেড়ে মুছে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা, প্রত্যেকের ব্যবহৃত লুঙ্গি, গামছা গেঞ্জি, সায়া, ব্লাউজ, শাড়ি, বিছানার চাদর কাচাকুচি করে ছাদে মেলে দেওয়া, তারপর বাসন-কোসন তৈজসপত্র মেজে পরিষ্কার করে ধুয়ে মুছে যথাস্থানে সাজিয়ে রাখা, ফুল গাছে জল দেওয়া, ফুলের টবগুলোতে প্রয়োজন হলে মাটি দেওয়া, পোষা পাখিগুলোকে, কুকুর, খরগোশ, বেবুন এদের ঘর পরিষ্কার করা, তারপর ওদের খেতে দেওয়া ইত্যাদি যাবতীয় কাজ ঠিক ঠিক মত হল কিনা, সেগুলোর তত্ত্বাবধান করবে ন্যাড়াবৌদি।

মনের মত না হলে নিজের হাতে করে দেখিয়ে দেবে। তবে তার শান্তি। দিবারাত্রি সব সময় ব্যস্ত থাকে ন্যাড়াবৌদি। এর মধ্যে সমানে মুখ চলে। কেউ যেন ওর কোন কথার জবাব না দেয়, মার কড়া নির্দেশ। কেউ জবাব দেয় না, অশান্তিও হয় না।

খামার বাড়িতে লোকগুলোকে খাইয়ে এসে বললাম—'বৌদি, এরপর ওদের আসতে বারণ করেছি। হুঁশিয়ার করে দিয়েছি, কোনদিন যেন না আসে।' দুধ-সাদা ধবধবে দাঁতগুলো বের করে বৌদি প্রসন্ন হাসি হেসে আত্মতৃপ্তি লাভ করল। মা সবই বুঝল—বুঝল রাঙাবৌদিও।

বাড়ির কোন লোকের অসুখ-বিসুখ হলে তার সমস্ত শুশ্রূষার দায়িত্ব ন্যাড়াবৌদির। ডাক্তার আসতে দেরি করলে তিনিও রেহাই পেতেন না। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় রোগীর শুশ্রূষা করার কায়দা দেখে যে কোন চিকিৎসক খুশি হতেন। রোগীর ক্ষমতা ছিল না ন্যাড়াবৌদিকে না জানিয়ে নিজের হাতে ওষুধ খায়। ডাক্তারের কাছে ওষুধের ফিরিস্তি জেনে নিয়ে নিজের হাতে তা প্রয়োগ করবে। অন্য কারো যুক্তি মানবে না। সত্যিই তাঁর শুশ্রূষায় রোগী দ্রুত সেরে উঠতো।

সকালের কাজ শেষ হলে প্রথম দফা স্নান সেরে পরিচারিকাদের নিয়ে চা-এর মজলিসে বসে বৌদি। তখন বেশ হাসাহাসি চলে। এরপর রান্নার কাজে জোগান দিতে আনাজপাতির কাটাকুটি ইত্যাদি কাজ। জেলে এসে মাছ ধরার জন্যে ডাকাডাকি করতেই পুকুর পাড়ে গিয়ে জাঁকিয়ে বসে বৌদি। জেলে বা জেলেনিরা যেন মাছ চুরি করে পোঁটলার মধ্যে পুরতে না পারে। ছোট মাছ মারলে জেলের রেহাই নেই। একই পুকুরে পর পর দু'দিন মাছ ধরা চলবে না। পুকুরে প্রতিবেশীদের হাঁস নেমে নতুন ছোট্ট চারাপোনা খেয়ে ফেলার আশঙ্কায় বাড়ি বাড়ি গিয়ে তাদের হুঁশিয়ার করে আসা। পুকুর পাড়ে বাঁশ-ঝাড়ের বাঁশ কেউ রাতের অন্ধকারে চুরি করেছে কিনা, করে থাকলে ফেলে রাখা কঞ্চিগুলোকে গুছিয়ে আনা—পুকুর পাড়ের ১০ / ১৫টা তালগাছের কতগুলো পাকা তাল পড়েছে, পাড়ার কোন্ ছেলে কুড়িয়ে নিয়ে গেল, বাকি ক'টা পাওয়া গেল, কলার কাঁদি কতগুলো তার মধ্যে

ক'কাঁদি পাকা কলা কত কাঁচাকলা, কটা মোচা পাওয়া যাবে, মাকে সব রিপোর্ট দেওয়া, কৃষাণদের ডেকে এনে খেজুর গাছে উঠিয়ে পাকা খেজুরের কাঁদি কাটা, গাছ থেকে পাকা আতা পেড়ে আনা, পাকা আনারস কেটে এনে. বাতাবি লেবু পেড়ে ধুয়ে মুছে রোয়াকের একধারে গাদা করা, পাতি লেবু, লাউয়ের ডগা, মাচান থেকে পুঁইডাটা, শশা সংগ্রহ করে জলে ধুয়ে বাড়িতে আনা ইত্যাদি হরেক রকমের কাজ ন্যাড়াবৌদির। এরপর দ্বিতীয় দফার স্নান। স্নানের পর ভাল রকমের টিফিন খেয়ে ও সকলকে খাইয়ে মাছ কুটতে বসা, আনাজ-পাতি ধোয়া-ধুয়ি করা, ইস্কুল ফেরত বাচ্চাকাচ্চাদের খাওয়ার পর এঁটো বাসনকোসন কলতলায় পৌঁছে দিয়েই গোয়ালার ডাকে গাই গরুর বাছুর ধরা, দুধ পরিমাণ মত হল কিনা, চাকরবাকর গাইগুলোকে স্নান ঠিকমত করায় কিনা, গরুর জাব এবং ভুষি চুরি করে কিনা সব রিপোর্ট মাকে জানায় বৌদি। এরপর সর মন্থন করে ঘোল তৈরি এবং মাখন থেকে ঘি তৈরি, নারকেল কুড়ে মেঠাই তৈরি, ভাজা খৈ থেকে মুড়কি তৈরি, ছোলার নাড়ু, তিলের ছাঁই তৈরি করে মাকে হিসেব দেওয়া, এরপর চাল কুমড়ো ছিঁচে মাসকলাই ও মুসুরি ডালের দু রকম বড়ি করে ছাদে শুকোতে দেওয়া, ইত্যাদি কাজ শেষ হলে মাকে স্নান করিয়ে দেওয়ার পর তৃতীয় দফার স্নান সেরে নেয় ন্যাড়াবৌদি। এ সব ছিল রুটিন মাফিক দৈনন্দিন কাজ। রান্নাঘরের দায়িত্বে থাকত রাঙাবৌদি। এরপর খাওয়া দাওয়ার তত্ত্বাবধান করা। কে খেল, কে খেল না, কেন খেল না, কার শরীর খারাপ, কে ওষুধ খায়নি, কেন খায়নি তাকে খাওয়ানো। তারপর খাওয়া দাওয়া সেরে বাচ্চাদের ও বাবা-মার বিশ্রামের ব্যবস্থা করে দিয়ে নিজের একটু গা গড়ানো।

দীর্ঘদিন একাদিক্রমে এ সব কাজ করতে করতে আর জল ঘাঁটা-ঘাঁটির সঙ্গে বার বার স্নান করা ইত্যাদির জন্যে হাতে পায়ে সাদা হাজা লাগার লক্ষণ দেখা গেল। রাতে শোয়ার পূর্বে হাতে পায়ে সরষের তেল লাগিয়ে শুতে হত বৌদিকে।

কাজ নিয়েই ব্যস্ত থাকত। দুঃখ করারও অবকাশ নেই তার।

কিন্তু এত কাজে ডুবে থাকা সত্ত্বেও শেষ রক্ষা হল না। শেষের দিকটা শুচিবাই হয়ে উঠল বৌদি। মর্জি মত কাজ। কখনও ভাল, কখনও মন্দ, কখনও গম্ভীর, কখনও হাসিখুশি। কেউ তার কাজের সমালোচনা করলেই বিপদ। কেবল মাকেই ভয় পেত।

এরপর তার মস্তিষ্কের রোগ বেড়ে গেল। সবার অলক্ষ্যে ইস্ত্রি করা কাপড়-চোপড় সার্ফে ডুবিয়ে দিত। ধোয়া মোজা গেঞ্জি জামা কাপড় আবার ধুতো। তাকে কেউ যেন কিছু না বলে, মা সকলকে জানিয়ে দিত। মা বলত, স্বামী মরার শোক সামলাতে না পেরে এ রকম হয়ে গেছে, তোমরা সহ্য কর।

খুচরো পয়সা অর্থাৎ পঁচিশ, পঞ্চাশ, একটাকার মুদ্রা তো জলে ধুয়ে নিতই, একটাকা, দুটাকা, পাঁচ-দশ টাকা, একশো টাকার নোটগুলোও জলে ধুয়ে নিয়ে উনোনের পাশে রেখে শুকিয়ে নিত।

সদ্য পালিশ-করানো জুতোগুলোকে জল ছিটিয়ে নিজে পালিশ করে স্ট্যাণ্ডে সাইজ করে গুছিয়ে রাখত। ধোপা জামাকাপড় দিয়ে গেলে যদি কারো নজরে না পড়ত তা হলে সেগুলো কেচে ছাদের কার্নিশে মেলে দিত। কি সমাচার? না, ধোপারা খোলা মাঠে কাপড় শুকোতে দেয়, অতএব অচ্ছুৎ ও সব কাপড়। ভাল জলে ডুবিয়ে না নিলে পবিত্র হবে না। দিনের মধ্যে চার পাঁচ বার নিজের হাতে ঘর রোয়াক, পৈঠে না ধুলে সে তৃপ্তি পেত না। কেউ বমি করলে তার মহা আনন্দ। দশ বালতি জল দিয়ে ধুয়ে ফিনাইল দেবে আর বিড়বিড় করবে তারপর আর একবার স্নান করার সুযোগ হওয়ায় বেজায় খুশি। তার নিজের জন্য পাঁচ ছ' জোড়া পোশাক-আশাক সব সময় নিজের আলনায় গুছিয়ে রাখত। বার বার স্নান করার ফলে তার কাপড়ের অভাব যাতে না ঘটে।

একদিনের এক মর্মান্তিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে ন্যাড়াবৌদির সঙ্গে আমার ঝগড়া হয়ে গেল, আমি ধৈর্যের বাঁধ রুখতে পারিনি। আমি তখন কোলকাতার কলেজে পড়ি। কোলকাতা থেকে দেশের বাড়িতে আসার সময় 'হরলালকা' থেকে পিওর উলের একটা সুন্দর শাল কিনে

আনি। যেদিন আসি, সেদিনই দুপুরের খাওয়া-দাওয়া সেরে আমি দিবানিদ্রা যাচ্ছিলাম; সেই সুযোগে ন্যাড়াবৌদি বাড়ি-সংলগ্ন সানবাঁধানো ঘাটে আচ্ছামত সাবান দিয়ে পিটিয়ে পাটিয়ে আছাড় দিয়ে নতুন শাল-টাকে মনের মত পরিষ্কার করে ধুয়ে লোহার রডে ঝুলিয়ে দিয়েছে শুকোবে বলে।

রাঙাবৌদি আমাকে ঘুম থেকে উঠিয়ে গোপনে বলে সরে পড়ল। আমি দৌড়ে গিয়ে দেখলাম যা হবার হয়ে গেছে। ঘাটে বৌদি ডুব দিচ্ছে। একগাল হাসি হেসে বলল, মেজবাবু ট্রেনে আসার সময় অনেক অচ্ছুৎ লোকের ছোঁয়া লেগেছে তাই তোমাব শালটা কেচে দিয়েছি। আমি বললাম, আমি আর ও শাল গায়ে দেব না, কাউকে দিয়ে দেব। শুনে বৌদি বিড় বিড় করে নানা কথা শোনালো। রাগে রাগে আমি আবার গিয়ে শুয়ে পড়লাম। মনটা খুবই খারাপ হয়ে গেল। সেদিন কারো সঙ্গে কোন কথাই বললাম না। বিকেলে খেলার মাঠে চলে গেলাম।

চাষকাজের জন্যে আমাদের বেতনভুক তিনজন লোক ছিল। পরের দিন ঘুম থেকে উঠে ন্যাড়াবৌদির বেড়ি-রাখা পেস্ট-ব্রাশে হাত না দিয়ে বাইরে গিয়ে খামার বাড়ির একজন কৃষাণকে বললাম, নিমের ডাল ভেঙে দে। দাঁতন করব। সে তাই করল। আমি বাড়ি এসে মুখ ধুয়ে শালটা আলনা থেকে তুলে নিয়ে কৃষাণটাকে দিয়ে এলাম। বললাম, তুই গায়ে দিবি। শালটা হাতে নিয়ে কৃষাণটা দেউরির সিং দরজার পাশে ঘোরাফেরা করতে লাগল, গিন্নিমার দেখা পাবার আশায়। আগের দিন সন্ধ্যাতেই শাল-কেলেঙ্কারি খামার বাড়ির লোকেরাও জেনে গেছে। হঠাৎ মার দেখা পেতেই প্রণাম জানিয়ে কৃষাণটা মাকে বলে, গিন্নিমা মেজবাবু রাগ করে শালটা আমাকে দিয়ে এসেছেন, আমি ভয়ে তাঁকে ফেরত দিতে পারিনি তাই আপনার কাছে এলাম ফেরত দিতে। মা বললেন, রোয়াকের একধারে রেখে যা। তারপরই মার আশঙ্কা হল কৃষাণরা শাল ছুঁয়েছে জানতে পারলে ন্যাড়াবৌদি ভালভাবে পিটিয়ে কাচবে। সব কূল বজায় রাখতে মা শালটা লুকিয়ে রাখল। আমি

ক্লাব থেকে ফেরার পর রাঙাবৌদির কাছে যখন খেতে বসেছি, তখন ধীর পদক্ষেপে মা এসে আমার পাশে একটা মোড়ার ওপর বসল, তারপর পিঠে হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, একটা মাথা খারাপ লোককে খোঁচানো মানে ভিমরুলের চাকে ঢিল মারা। বিশ বছর ওকে বুকে করে রেখেছি—অশেষ যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়েছে। কেন জান? আমাদের বুনিয়াদি বংশের মর্যাদা নষ্ট হবে। লোকে টিটকারি দেবে। ও বিধবা, নিঃসন্তান। আমরা ছাড়া পৃথিবীতে ওর কেউ নেই অনেক সময় অসহ্য লাগে—তবুও কিছু করার নেই। ওর মাথাটা গেছে, এরপর প্রাণটা গেলেই হয়। যে ক'টা দিন বাঁচে কেউ কিছু বলো না। সারাদিনে দশটা লোকের কাজ করে। আমি কতদিকে নিশ্চিন্ত। সংসার অটুট রেখেছে ও, আমাকে কোনদিকে নজর দিতে হয় না। এর মধ্যে কোন কিছু অঘটন ঘটালে সহ্য করা ছাড়া উপায় নেই।

আমার মা অত্যন্ত শান্ত-শিষ্ট, শান্তিবাদী। সে যুগের এক প্রতাপ-শালী জমিদারের মেয়ে। মার কথার জবাব দেওয়ার সাধ্য কোনকালেই আমার ছিল না—মাকে খুশি করার জন্যে ন্যাড়াবৌদির প্রসঙ্গ চাপা দিয়ে রাঙাবৌদির তৈরি রাবড়ির প্লেটটা এমনভাবে চাটতে লাগলাম যেন জীবনে এই প্রথম খাচ্ছি। রাঙাবৌদি পিঠে এক চাপড় মেরে মা-র সামনে আরও অনেকখানি প্লেটে ঢেলে দিল। মা হাসতে হাসতে চলে গেল। পরদিন সকালে মা আমাকে ডেকে বলল, নতুন শাল কেনার টাকা আমি তোমাকে দেব। যে কৃষাণটা ভয়ে ভয়ে শালটা ফেরত দিয়েছে শুধু ওকে দিলেই ভাল দেখাবে না, আরও দুজনের মন খারাপ হবে, অতএব তিনজনকেই মাঠের কাজের জন্য সুতির মোটা গায়ের চাদর কিনে দেবে। ওরা কত না খুশি হবে। পরদিন কাটোয়া শহর থেকে সুন্দর তিনখানা গায়ের চাদর কিনে আনলাম যা মাঠের কাজের পক্ষে উত্তম। টাকা মা-ই দিয়েছিল।

পরদিন সকালে কৃষাণরা গরু লাঙ্গল নিয়ে মাঠে বেরুবার আগে গোলাবাড়ির সারি সারি ধানের মরাই বা গোলার পাশে একটা চেয়ার নিয়ে গিয়ে মাকে বসতে দিলাম। চাদর তিনখানা মা-র হাতে দিয়ে

খামার-বাড়ির গেটের কাছে গিয়ে তিন কৃষাণকে ডাকলাম। হাতের কাজ ফেলে ওরা দৌড়ে এল। বললাম, 'এদিকে আয়, মা গোলাবাড়িতে অপেক্ষা করছে তোদের জন্যে। ওরা চটপট এল। মাকে প্রণাম করল। মা আমাকে বলল, 'খোকা তুমি হাতে করে ওদের তিনজনকে তিনখানা দিয়ে দাও।' তাই দিলাম। তারা চাদর হাতে পেয়ে বার বার মাকে প্রণাম জানাতে লাগাল। মা বলল, বাবা, তোরা আমার খোকাকে আশীর্বাদ করবি। তোরা অসহায়, ভগবান তোদের প্রার্থনাই মঞ্জুর করবেন। তারা চাদরসহ হাত দুটো ওপর দিকে তুলল—ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে। মা খুব খুশি হল। মাকে নিয়ে বাড়ি ফিরলাম।

উল্লেখ্য, তিনজন কৃষাণকে বাড়িতে ডেকে চাদর দিলে যে জায়গায় ওরা দাঁড়াতো সেখানে অন্তত দশ বালতি জল ঢেলে গোবর ছড়া দিত ন্যাড়াবৌদি। যন্ত্রণার একশেষ। কত আর বলি।

ন্যাড়াবৌদির সঙ্গে দুদিন আমার কথা নেই। কোলকাতা আসব বলে খেতে বসেছি, কানে এল ন্যাড়াবৌদির চিৎকার। ঝারির সাহায্যে ফুলগাছগুলোতে জল দিতে দিতে রাঙাবৌদিকে শাসন করছে 'বড় মাছের মুড়োটা মেজবাবুকে দিতে বলেছি কিনা, মেজবাবুর দুধটা আরও ঘন করতে বলেছি কিনা, প্রত্যেক দিন কি দশবার করে বলতে হবে? কানের মাথা খেয়ে বসে আছ?'

আমার মনে হ'ল ন্যাড়াবৌদির এসব কথা শুনে মা বিরক্ত। রাঙাবৌদিও তো পরের মেয়ে! সে যে নিজেকে শ্বশুরবাড়িতে অসহায় মনে করবে। এতে ঈশ্বর ক্ষুণ্ণ হবেন। মা ইশারা করে ডাকল রাঙাবৌদিকে। ও যা বলুক কান দিও না। ওকে ভয় করার কিছু নেই, আমরা তোমার পক্ষে।

মনে হল রাঙাবৌদি সতেজ হয়ে উঠল—দেহে ও মনে শক্তি ফিরে পেল। হাসতে হাসতে রান্নাঘরে গিয়ে ছোট বড় দুটো মাছের মুড়ো আর দুখানা ভাজা মাছ আনল। হাসতে হাসতে বললাম, 'আচ্ছা বড়টা আমি খাচ্ছি, ছোট মুড়োটা ঐ পাগলিটাকে দিও। আমি কোলকাতা

চলে যাওয়ার পর খাবার সময় মুড়োটা ওর পাতে দিয়ে বলবে আমি ওকে খেতে বলেছি।'

মা আমাকে সমর্থন করে বলল, তুমি সঠিক পথ ধরেছ।

কোলকাতা ফেরার সময় মা বাড়তি টাকা দিয়ে বার বার অনুরোধ করল যেন কোলকাতা পৌঁছেই অনুরূপ একখানা শাল কিনে নিই। কোন রকম ঠাণ্ডা লেগে শরীর যেন খারাপ না হয়। মাকে পাকা কথা দিলাম।

কোলকাতা ফেরার সময় ন্যাড়াবৌদিকে প্রণাম করিনি। এমনকি কথাও বলিনি, যদিও সে মার পেছনেই দাঁড়িয়ে ছিল। আর কোনদিন কথা বলতেও হয়নি। ঝগড়ার কথাই শেষ কথা।

কোলকাতা ফেরার পাঁচদিনের দিন একটা টেলিগ্রাম পেলাম: ন্যাড়াবৌদির অবস্থা সঙ্গিন। টেলিগ্রাম পাওয়ামাত্র যেন চলে আসি।

চলেই এলাম। এসে দেখি খাঁচার পাখি উড়ে গেছে। বাড়িতে লোকজনের ভিড়। ন্যাড়াবৌদি মৃত্যুশয্যায় শায়িতা। স্ট্রোক হওয়ায় কয়েক ঘণ্টা অজ্ঞান ছিল। হাসপাতাল যাওয়ার পথে মৃত্যু হয়।

চোখের জলে চারিদিক আবছা দেখছি। বুকের মেটেখানা দুমড়ে মুচড়ে যাচ্ছে। তার পা-দুটো স্পর্শ করে শেষ ক্ষমা চাইলাম। তার আত্মা আমায় ক্ষমা করল কিনা জানি না, তবুও আমার বিশ্বাস অন্তরের ন্যাড়াবৌদি আমাকে ক্ষমা না করে পারবে না। ঈশ্বর তার আত্মার শান্তি দিন। এটাই আমার একান্ত প্রার্থনা।

তারপর থেকে আজও ন্যাড়াবৌদিকে হৃদয়ের মণিকোঠায় সাজিয়ে রেখেছি। তাই আজও তাকে মাঝে মাঝে স্বপ্নে দেখি। ঘুম ভাঙলে মনে হয় 'জীবন তুমি কার?'

পাঁচিকে সঙ্গে আনত পাঁচির মা। রোজ সকালে। খামারের কাজে। তিন-চার বছরের মেয়ে পাঁচি। তাকে একপাশে বসিয়ে রেখে কাজ করত। গোয়ালঘরের গাই-বলদের মলমূত্র পরিষ্কার, ছাই ছিটোনো,

ছানিঘরের কাটা ছানিগুলোকে গাদা করে রাখা, যাতে মাঠ থেকে ফেরার পর কৃষাণরা টাটকা ছানিগুলো গরুর পাত্‌নায় দিতে পারে। পাত্‌না (গরুর খাবারপাত্র) গুলো জল দিয়ে ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার রাখা, গোবরগুলো একটা খাদে জড়ো করে পা-দিয়ে চট্‌কে মোলায়েম করে খামারবাড়ির দেওয়ালে জ্বালানির জন্যে ঘুঁটে দেওয়া, খামারবাড়ির বিচালির গাদা বা গোয়ালের নিচের ধানগুলো যাতে অপর লোকের হাঁস-মুরগী, ছাগলে খেয়ে না নেয় তার জন্যে পোয়াল গাদা ঠিক করে চারিদিকে ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার করা। এ সব কাজই ছিল পাঁচির মার। ছুটি হলে একসের চাল, এক আনা পয়সা, মুড়ি গুড় তেল আলু নিয়ে বাড়ি ফিরত খুব গরিব মেয়ে পাঁচির মা। জাতিতে ছিল চর্মকার শ্রেণীর, পাড়াগাঁয় বলে 'মুচি'। আধুনিককালে বলে দাস। এরা গরিব কিন্তু খুব ভদ্র এবং বিশ্বাসী। আমাদের পরিবার এদের কাছে খুব উপকার পেত। গোলাবাড়ির ধানের গোলার চাবি থাকত এদের হাতে। গ্রাম থেকে দূরে ধান চাষের মাঠে আমাদের বিরাট পুষ্করিণী ষোল বিঘা যার জলকর। আজকাল বারো বিঘায় দাঁড়িয়েছে—সে পুকুর আজও আমাদের আছে। তার চতুষ্পার্শে পর্যাপ্ত ধান হয় আর চার বিঘার মত গভীরে প্রচুর রুই-কাতলার চাষ হয়। ঐ সব লোক তখনও পাহারা দিত, আজও তাদের বংশধরেরা পাহারা দেয়, আমাদের বংশের যারা সেখানে থাকে তাদের হয়ে। এরা অত্যন্ত বিশ্বাসী ও কর্তব্য-পরায়ণ। ফসল চুরি যায় না—মাছও না। আমাদের লোকেরাও ওদের সাহায্য করে খুবই। জমিদারী সরকার অধিগ্রহণ করেছে—আমরা এখন মধ্যবিত্ত কিন্তু এদের কাছ থেকে আমরা সে যুগের সম্মান আজও পাই।

একাদিক্রমে বহুদিন কাজ করার পর পাঁচির মা বৃদ্ধ হয়েছে। চোখে তেমন দেখতে পায় না। পাঁচিকে চাকরিতে বহাল করে সে অবসর নিয়েছে। পাঁচির বয়স তখন বারো-তেরো। সে সব কাজ পারে। চটপটে, চতুর, জেদি মেয়ে। অন্যায়কে প্রশ্রয় দেয় না। নিজে এককণা চালও চুরি করে না, অপরকে চুরি করতে দেখলে ছেড়ে

কথা কয় না। খুব চঞ্চল, দাপটও খুব। ভীষণ কর্মপটু। অল্পদিনের মধ্যে মার খুব প্রিয়পাত্রী হয়ে ওঠে পাঁচি। খামারবাড়ি-গোয়ালবাড়ি, পুকুরপাড়, সবজির মাঠ সর্বত্র দাপিয়ে বেড়ায়। পাতলা গড়ন হলেও যেন ইস্পাতে গড়া, বাঁশির মত নাক। দুধ সাদা ধবধবে দাঁতে হাসির ফোয়ারা ছোটে। বেতন ছাড়াও বাড়তি পয়সা আদায় করে মার কাছ থেকে। মাকে স্পেশাল সার্ভিস দিয়ে। সে গাছে চড়ে আমড়া পাড়ে, পেয়ারা পাড়ে, নারকেলের পাতা ঝোড়ে—জ্বালানি কেটে গাদ করে, তালপাতার বাগড়া ঝোড়ে, বাঁশের শুকনো কঞ্চি কেটে সাইজ করে। এ ধরনের বহু কাজ করে। এখন আর ন্যাড়াবৌদির অভাববোধ করে না মা।

মার হুকুম নিয়ে পুকুর থেকে কল্‌মি শাক সুষনি শাক, ক্ষেত থেকে পাট শাক, গাছ থেকে সজনে শাক, মাচা থেকে করলা, শিম লাউ পুঁইশাক সবই সে সংগ্রহ করে। মার জন্য সিঙি মাছ, মাগুর মাছ বড় বড় জালাতে বালতি বালতি জল ঢেলে জিইয়ে রাখে। মাকে রৌদ্রে বসিয়ে তেল মাখানো, স্নান করানো এসব তো আছেই, মা কী কী খেতে ভালবাসে প্রকাশ্যে গোপনে, সে সব সংগ্রহ করে, মার কাছ থেকেই টাকা নিয়ে। মা খায় আর ওকে খাওয়ায়—এগুলো হচ্ছে খাবারের দোকানের গরম গরম সিঙারা, আলুর চপ, নোন্‌তা খাবার। পাঁচির মত প্রাইভেট সেক্রেটারি পাওয়ায় মা অনেকদিক থেকে শান্তি পায়। পুজোর সময় ফিরিওয়ালার কাছ থেকে রোল্ড গোল্ডের গয়না কিনে মা পাঁচিকে সাজিয়ে দেয় পাড়ায় পাড়ায় ঠাকুর দেখতে যাওয়ার সময়। কপালে টিপ্, ঠোঁটে লিপষ্টিক, কানে ঝুমকো দুল, মাথায় রিবন ফিতে, মুখে মেকআপ সব শিখিয়েছে মা। ওর জন্যে আয়না, চিরুনি, পাউডার, আলতা, প্লাষ্টিকের চুড়ি কত কী। আমরা কিছু কিছু টের পেতাম। কিন্তু মার তো কোনো বন্ধু নেই এখন পাঁচিই বন্ধু—মার একান্ত সচিব অতএব এখানে জাতি-বিচার নেই—একেবারে আত্মার আত্মীয়। মার মহৎ হৃদয়ই মানুষকে, ভগবানের দান বলে সকল শ্রেণীর মানুষকে ভালবাসতে শিক্ষা দিয়েছে। পাঁচির সঙ্গে

মার এই ধরনের শিশু-সুলভ খেলা দেখে বাবাও মুচকে হাসেন। এমনও অনেক সময় দেখেছি মা সময় কাটাবার জন্য পাঁচিকে নিয়ে লুডো খেলছে। খুব ভাল লাগে আমারও।

আমাকে ছাড়া পাঁচি ভয় করে না কাকেও। আমাকে ভয় ক'রে চলতে মা-ই তাকে শিখিয়েছে। পাঁচি আমাকে কোলকাতার সাহেব বলে ভয় করে। বন্ধুমহল থেকে বাড়িতে ফিরে দেখি আমার ঘরের আসবাব পত্র ঝেড়েমুছে চকচক করে রেখেছে। মা-ই শিখিয়েছে, বাবু যখন কোলকাতা যাবে, তখন আমাকে প্রণাম করবে, ওর বাবাকে প্রণাম করবে ; তুই আমার পিছনে দাঁড়িয়ে থাকবি, দেখবি তোর হাতে বকশিশ দেবে। হাত পেতে নিবি। বিদায় নেওয়ার সময় মা পাঁচিকে বলে 'বাবু কোলকাতা যাচ্ছে, তোর জন্যে কি কি আনতে হবে বলে দে'। বলতে সাহস পায় না—মার পিছনে দাঁড়িয়ে থাকে। বাঁ হাত নিজের চোখে ঘষতে থাকে—মা বলে ওর জন্যে এক ডজন কাচের চুরি, ফিতে, সেফটিপিন এনো। পুঁথির মালাও এনো।

বলি, 'আনব।' তারপর পাঁচিকে বলি এই নে বকশিশ। মা-র পিছন থেকে ডান হাতটা বাড়ায়। বকশিশ দিই। মা তাকে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার কিনে দিয়েছে—তাতেই জমা করে।

পরের বারে কোলকাতা থেকে গাঙ্গুরামের সন্দেশ, একবাক্স আঙুর, একবাক্স আপেল, মোসাম্বি আনি। ওর জন্যে কাচের চুড়ি, সেফটিপিন, ফিতে সবই আনি, কিন্তু বের করিনি। ওর বিরাট আশা, কোলকাতার জিনিস পরে পাড়ার মেয়েদের দেখাবে। কিন্তু আমার কাছ থেকে কিছু না পাওয়ায় একেবারে মনমরা। বুঝতে পেরে মা বলল, তুমি কি ভুলে গেছ ? ওর জন্যে কাচের চুড়ি, ফিতে আরও কি কি কিনে আনতে বলেছিলাম ?

বলেই মা আমার দিকে তাকিয়ে থাকে। আমি দেরাজ খুলে ওগুলো মার হাতে তুলে দিই। মার সমগ্র মুখমণ্ডল তখন যে রূপ নেয়, তাঁর মৃত্যুর পঁচিশ বছর পরেও আজ আমার সামনে তা পরিষ্কার ফুটে উঠছে। হাজার চেষ্টা করলেও মাকে আজ আর সামনে আনতে পারছি না।

একদিন মা বলল, 'খোকা বড় বৌ-এর মৃত্যুর পর আজ পর্যন্ত বাগান বাড়ির দরজার তালা খোলাই হয়নি। মনে হয় তত্ত্বাবধানের অভাবে বাগানের গাছপালা নষ্ট হয়ে গেছে কিংবা গাছ পালা লতাপাতায় জড়িয়ে জঙ্গলে পরিণত হয়েছে। একবার তালা খুলে দেখে এস। যদি খুব জঙ্গল হয় তাহলে কৃষাণদের বলে ভাল মজুর জোগাড় করে বাগানটা পরিষ্কার করাতে হবে।' আমি চাবি নিয়ে তালা খুলে পাকা আনারস, বাতাবি লেবু, পাতিলেবু, পাকা আমড়া সবই দেখতে পেলাম কিন্তু আগাছায় ভর্তি। সাপটাপও থাকতে পারে। মা বললেন 'আজ থাক, আগামী কাল বাগান পরিষ্কার করাতে লোক পাঠাব।' কৃষাণদের বলায়, ওরা মজুর ঠিক করে দিল। কয়েকঘণ্টার মধ্যে বাগানের আগাছা কেটে তারা পরিষ্কার করল—পাঁচির হাতে একটা থলে দিয়ে মা বলল, 'বাবুর সঙ্গে তুই যা, মজুররা যা যা দেবে নিয়ে আয়।' আমি মজুরদের বলায় পাকা আনারস, বাতাবি লেবু, কাঁচা পাকা আমড়া, পাতি লেবু সবকিছু তুলে তারা পাঁচির থলেতে দিল। পাঁচি নিয়ে চলে গেল। একটু পরে মজুররাও চলে গেল।

ন্যাড়াবৌদির স্মৃতিবিজড়িত তাঁর বড় সাধের আমড়া গাছের নিচে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম। চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ল। চোখ মুছতে মুছতে বাগান থেকে বেরিয়ে এলাম।

*　　*　　*

ইংরাজি ১৯৫৪ সাল, বাংলা ১৩৬১। স্বাধীন ভারতের গণতান্ত্রিক সরকার আইন পাশ করে জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ ঘোষণা করে। দেশ স্বাধীন হওয়ার ঠিক সাত বছর পর। জমিদারী প্রথার বিলোপ সাধন ঘটিয়ে সমস্ত সম্পত্তি সরকার অধিগ্রহণ করে। চাষ বাস যাদের জীবিকা তাদের জমি রাখার উর্ধ্ব সীমা বেঁধে দেওয়া হয়। জমিদারী সরকার অধিগ্রহণ করার ফলে জমিদারদের ক্ষতিপূরণ বাবদ বাৎসরিক নির্দিষ্ট টাকা সরকার কর্তৃক বৎসরে একবার দেওয়া হবে বলে ঘোষণা করা হয়। সুতরাং জমিদারী পরিচালনার জন্য নায়েব গোমস্তার প্রয়োজন না থাকায় তাদের প্রাপ্য টাকা মিটিয়ে দিয়ে বিদায় দেওয়া

হয়, জমি রাখার উর্ধ্বসীমা-বহির্ভূত জমি সরকারের খাস জমি বলে সরকার ঘোষণা করে। ঐ খাস জমি গরিব চাষীদের মধ্যে বিলি বন্দোবস্তের কথাও ঘোষণা করা হয়।

এর ফলে নিজেদের স্ট্যাণ্ডার্ড ও স্ট্যাটাস বাঁচিয়ে পাড়াগাঁয়ে পড়ে থাকা কষ্টসাধ্য বিবেচনা করে কোলকাতা শহরে ব্যবসা বাণিজ্য করে বাবা-মাকে সেখানে রেখে শান্তিতে থাকব—এটাই ঠিক হয়। ব্যবসার জন্য প্রয়োজনীয় টাকা বাবা দেবেন বলে জানান। আমি উপযুক্ত ব্যবসা খোলার উদ্দেশ্যে কোলকাতায় জায়গা খুঁজতে থাকি।

পাঁচি তখনও মার সেবায় নিযুক্ত। তার বয়স তখন সতের/আঠার হয়েছে। সে বয়সে তাকে আর গোয়াল বা খামারের কাজ করতে দেওয়া হতো না। চাকর বাকরের কাছেও যেতে দেওয়া হতো না। বাইরের সব কাজ চাকর বাকররাই করতো।

পাঁচির অনুপস্থিতির সুযোগে তারা কোনও কোনও জিনিস চুরি করে রাতের অন্ধকারে বাড়ি নিয়ে যেত। পাঁচি সজাগ থাকতো। কখন কে, কি চুরি করে নিয়ে যায়।

খামার বাড়িতে ছিল তিনটে তালগাছ। ছিল নয়, এখনও আছে। প্রচুর তাল হয়। ভাদ্রমাসে পাকা তাল পড়ে। এক একটা গাছে তিন চারশো তাল হয়। মা গরিব লোকদের মধ্যে বিতরণ করতো। দৈনিক গড়ে দশ-বারোটা তাল পড়ে। একটা পাকা তালের মাড়ি একদিনের জন্য একটা ফ্যামিলিতে যথেষ্ট। তালমাড়িতে আতপ চালের গুঁড়ো মিশিয়ে বড়া বা ফুলুরি তৈরি করা হয়। লুচি করতে গেলে লাগে ময়দা। তাল মাড়ি লুচির ময়দায় মিশিয়ে লুচি তৈরি করলে খেতে খুব অপূর্ব লাগে। এক একটা গরিবকে একদিনের জন্য একটা করে পাকা তাল মা দিত। তারা আতপ চালের গুঁড়ো দিয়ে বড়া অথবা ফুলুরি করে খেতো।

একদিন এক কৃষাণ চার-চারটে পাকা বড় তাল বিচালির গাদায় লুকিয়ে রেখেছিল। পাঁচি গাছের কাঁদির দিকে তাকালেই বুঝতে পারতো সেদিন বোঁটা খসে পড়েছে ক'টা তাল। সেদিন তার সন্দেহ

হয়েছিল। কিন্তু অনেক সময় বিচলির গাদার ওপর তাল পড়লে শব্দ বেশী হয় না। সেজন্য সে ঠিক বুঝতে পারছিল না সেদিনে তাল পড়ার শব্দ কবার শুনেছিল। সে অত্যন্ত সতর্ক—সব দিক থেকে। ছাদের ঘুলঘুলির ফাঁক দিয়ে সে মাঝে মাঝে লক্ষ্য করছিল খাওয়া-দাওয়া শেষ করে কোন্ কৃষাণ বাড়ি যাওয়ার পরিবর্তে খামার বাড়ির দিকে যায়—আকাশে চাঁদ থাকায় এটা সম্ভব হয়, অন্ধকার রাত্রে সম্ভব নয়। বাদল নামে একটা কৃষাণ খাওয়া দাওয়া সেরে খামার বাড়ির দিকে গিয়েছিল বিশেষ কিছু নিয়ে যাবার উদ্দেশ্যে। বিচলির ভিতর থেকে চারটে তাল বের করে সে থলিতে ভর্তি করছিল। পাঁচি দু-তিনটে সিঁড়ি বাদ দিয়ে দিয়ে লাফিয়ে নেমেই—এক দৌড়ে ধানের গোলার পাশে লুকিয়ে ছিল। বাদল থলেটা নিয়ে সরে পড়ার মুহূর্তে পাঁচি চিৎকার করে উঠল। ওর গলার শব্দ পেয়ে বাবা অন্য কিছু চিন্তা করে সদরের বাইরে চলে এল পাঁচির সামনে। পাঁচি বলল, কে যেন কি নিয়ে পালাচ্ছে। বাবা লাইট মেরে দেখল বাদল। বাবার পা দুটো জড়িয়ে ধরলো।

বাবা বলল, তুই ভুল করলি। চুরি করার প্রয়োজন কি। গিন্নিমা-কে বুঝিয়ে বললে চারটেই দিত। তুইতো নিজেদের লোক। আর তোকে কেউ বিশ্বাস করবে? চারটে তালই তুই নিয়ে যা। ইতিমধ্যে মা-ও সদরের বাইরে এসে গেছে। বাবা বলল, ঐ বাদলা চারটে তাল নিয়ে পালাচ্ছিল। পাঁচি দেখতে পেয়ে চেঁচিয়েছে। মা বলল, তাও ভাল। পাঁচি কোথায় না থাকে।

পরদিন বাদল আর কাজে আসেনি। বেলা হলে ওর বৌ এসে কান্নাকাটি করছিল। মা বলল, সে লজ্জায় আসেনি। তার চাকরি যাবে না। শুধু তাল নিয়ে কি দিয়ে খাবি। আতপচাল নিয়ে যা। সফেদা করে তালমাড়ি মাখিয়ে বড়া করে খাস কিংবা পায়েস করে খাস। বাচ্চাগুলো যেন শুকিয়ে না থাকে। আর কাল তাকে পাঠাবি। এসেই যেন প্রথমে আমার সঙ্গে দেখা করে।

পরদিন বাদল এসে গোলার পাশে দাঁড়িয়ে থাকল—গিন্নিমা আশ্বাস দিলে কাজে লাগবে কিন্তু পাঁচিকে ভয়ে বলতেই পারছে না যে সে গিন্নি-

মার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চায়। উত্তরের বারান্দা থেকে রাঙাবৌদি দেখে মাকে বাদল আসার কথা বলে। তৎক্ষণাৎ মা সদরের বাইরে এসে বাদলকে কাছে ডেকে বলে বাবা, আমার কেন, কোন লোকেরই কোন জিনিস না বলে নিও না, ঈশ্বর একজন আছেন। চুরি করা জিনিস ছেলেদের খাওয়ালে ছেলেরা অসুখ বিসুখে ভুগবে। এটাই তো শাস্তি। আমাকে যে কোন কথা খুলে বলবে আমি ঠিক ব্যবস্থা করব। বাদল হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলল। বলল, এখন থেকে সকলে আমাকে অবিশ্বাস করবে। আমি বুঝতে পারিনি গিন্নিমা এমন কাজ জীবনে আর করব না। মা বলল, খুব ভাল, তুই একটা কাজ কর্। সবজির মাঠে যা। মাঠ থেকে ঢেঁড়স, বেগুন, টম্যাটো আর কাঁচা কুমড়ো নিয়ে আয়। সে চোখ মুছতে মুছতে একটা থলে হাতে করে চলে গেল। ঘণ্টা খানেকের মধ্যে সব্জিগুলো নিয়ে আসার পর মা বলল, একটা ঝুড়ি করে মাচানের ওপর থেকে কিছু আলু পেঁয়াজ পাড়। ও থেকে কিছু আলু পেঁয়াজ ও সব্জি নিয়ে শিগ্গির তোর বৌকে দিয়ে আয়। বাচ্চা কাচ্চা যেন শুকিয়ে না থাকে। বাদল ঝুড়ি করে ওগুলো নিয়ে বৌকে দিতে গেল। বৌ-এর কাছে দু-চার কথা শুনে মন খারাপ করে খামারের কাজে লেগে গেল।

পরিবারের এহেন হিতাকাঙ্ক্ষী পাঁচিকে বেশিদিন আটকে রাখা ঠিক নয় একথা রাঙাবৌদি মাঝে মাঝে মাকে স্মরণ করিয়ে দিত। বাদলের ঘটনার পর রাঙাবৌদি বেশি জোর দিল পাঁচি প্রসঙ্গে। বৌদির ভয় বাদল বন্ধু বান্ধবদের সহায়তায় পাঁচির ক্ষতি করতে পারে। তখন হবে দুর্নামের একশেষ। ঠিক ঐ সময়ে ভিনপাড়ার এক পরিচিত মহিলা মার সঙ্গে দেখা করতে এসে বলে 'দিদি তোমার পাঁচি আর কচি খুকিটি নেই—ওর ভরা গাঙে জোয়ার এসেছে।'

এ ভাষাটা মহিলা মহলের মজলিসি ভাষা। অনেকদূর গড়ালে তবে পুরুষদের গোচরে আসে। যাই হোক, পাঁচির বিষয়ে মা একটু নড়েসড়ে বসল।

পরদিন পাঁচিকে বলল, তোর মার হাত ধরে একবার আমার কাছে

নিয়ে আয়, কথা আছে। অন্ধ মানুষ যেন হোঁচট না খায় খেয়াল করবি রাস্তা-ঘাটে।

পাঁচি বাড়ি গিয়ে তার মাকে নিয়ে এল। পাঁচির মার দৃষ্টিক্ষীণ। আবছা দেখে—বুঝে নেবার চেষ্টা করে। সেইভাবে মার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করার চেষ্টা করছিল। মা বাধা দিয়ে বলল, 'দুবেলাই তোর খাবার পাঠাই পাঁচির হাতে, যদি কোন জিনিস খাবার শখ হয় পাঁচিকে দিয়ে বলে পাঠাবি। আমি পাঠিয়ে দেব। তোকে খাওয়াতে পারলে আমি মনে শান্তি পাব। পাঁচিকে খাবারের দোকানে পাঠালো ওর মার জন্যে খাবার কিনে আনতে। তারপর পাঁচির মাকে বলল, পাঁচির বয়স ঠিক কত হয়েছে। জবাবে পাঁচির মা বলল, 'আঠারো উনিশ হয়েছে।' তাহলে ওর বিয়ের ব্যবস্থা এখনই করা দরকার। শুনে পাঁচির মা প্রসন্ন হাসি হেসে বলে, আপনি যেদিন দেবেন সেদিনই হবে। ঈশ্বরকে ডাকছি রাতদিন। ওর বিয়েটা দেখার জন্যে ঈশ্বর আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন।

মা বলল, শিগ্‌গির ওর বিয়ের ব্যবস্থা করছি। আবার যেদিন ডাকব আসিস।

পাঁচি খাবার নিয়ে হাজির হল। খাবার খাওয়া শেষ হলে হাতে পাঁচটা টাকা দিয়ে মা পাঁচিকে বলল, তোর মাকে বাড়িতে রেখে আয়।'

বিয়ের প্রস্তাব দেওয়ার পর মার দুশ্চিন্তা বেড়ে গেল। কোথায় বিয়ে হবে ঠিক নেই কতদিন পরে ও আসবে ঠিক নেই - আসলেও তো আবার চলে যাবে স্বামীর ঘরে। পাঁচির মত কাজের মেয়ে পাওয়া শক্ত। ঐ এলাকায় তো চোখে পড়ে না। মার ভাবনা বেড়েই গেল।

মনের অশান্তি দূর করতে মা আমাকে ডেকে পাঠালো। আমি গিয়ে মার মুখে যা শুনলাম তাতে বোঝা গেল পাঁচি চলে যাওয়া মানে মা নিঃসঙ্গ হওয়া। অশান্তিতে তাকে দিন কাটাতে হবে। বাধ্য হয়ে আমার বিয়ে দেবার জন্যে মা উঠে পড়ে লাগবে। আমি নিজেও বেশ অস্বস্তিতে পড়লাম। অনেক ভেবে চিন্তে মাথা খাটিয়ে ঠিক বুদ্ধি বের

করলাম এবং সেটা সম্ভব হলে মা আরও সুখী হবে বলে আমি নিশ্চিন্ত হলাম।

বিকেলে মাঠে যাওয়ার আগে দেখলাম গম্ভীর মেজাজে মা দাওয়ায় বসে একটা বই পড়ছে। বাবা তার চেম্বারে দলিল দস্তা কাগজপত্র ঘাঁটছে। বাবাকে ডাকলাম। দাওয়ায় বসে বাবা-মাকে বললাম আমি যেটা চিন্তা করেছি খুলে বলছি। পাঁচি অন্ততঃ আট / দশ বছর মার সেবাযত্ন করছে। মা ওর বিয়ে দিতে চায় খুব ভাল কথা—ওর বয়স হয়েছে—বিয়ে না দিলে লোকে আমাদের নিন্দে করবে। ওর বিয়ে দিতে খরচ খরচা আমাদেরকেই করতে হবে। ওর বিয়ে হয়ে গেলে ও-তো মাকে ছেড়ে চলে যাবে তখন মা-র দেখাশুনার জন্যে ঐ ধরনের মেয়ে পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না। মার বাকি জীবনটা দুর্বিষহ হয়ে উঠবে। সবদিক সামাল দিতে আমি চিন্তা করেছি এমন একটা সৎপাত্র জোগাড় করতে হবে যে পাঁচিদের বাড়িতেই আজীবন থাকবে এবং পাঁচি যেমন আমাদের বাড়িতে কাজ করছে তাই করবে আর তার স্বামী আমাদের বাড়িতেই কৃষাণ হিসাবে নিযুক্ত থাকবে। বেতন পাবে খাবার পাবে সবকিছু, এতে আমাদেরও উপকার, ওরাও বেঁচে যাবে। কথাটা শুনে মা নড়েসড়ে বসল—সে সময়ের মার মুখের হাসিটা আজও মনে পড়ছে। মার হাত থেকে বইটা পড়ে গেল। বাবা হেসে উঠল মনের মত কথা হয়েছে না? মা মাথার চুলে হাত ঠেকিয়ে চুল সোজা করে নিয়ে বলল ---সেজন্যেই তো খোকাকে ডেকেছিলাম যুক্তি করতে। এ রকমটা হলে আমার মনের মত হয়।

বাবা বলল, খোকার প্রস্তাব আমার কাছেও ভাল লাগল। আজ থেকেই আমি চেষ্টা করব স্বাস্থ্যবান, কর্মঠ, ভদ্র ওদের সমাজের একটা ছেলে। আমি চেষ্টা করলে হবে। দেখছি কি করা যায়। বাবা চলে গেল।

মার দীর্ঘশ্বাস আমাকে স্বস্তি দিল অনেকখানি ॥

মাস খানেকের মধ্যেই বাবার চেষ্টাতেই সৎপাত্র মিলল। সাংঘাতিক সৎ। আশাতীত। একই গ্রামের অন্য পাড়ায় তার বাড়ি। স্বাস্থ্যবান,

কর্তব্যপরায়ণ, বিনয়ী ও পরিশ্রমী। বাবার অনুগত সব পাড়ারই লোক। লোকমুখে কথাটা প্রচার হল। সবাই সন্তুষ্ট। কারণে অকারণে বাবার কাছে লোকজন এসে নমস্কার জানিয়ে বলে আপনি খুব ভাল কাজ করছেন। দুপক্ষই অত্যন্ত গরিব আপনার দৌলতে ওদের সংসার বেঁচে যাবে। বাবা আনন্দের হাসি হাসে।

কয়েকদিন যাবৎ লোকজনের এই রকমের আলোচনার ফলে বাবার উৎসাহ দ্বিগুণ বেড়ে গেল। বাবা আবার আমাকে ডেকে পাঠালো। মার কথা মতই বাবা ডেকে পাঠিয়েছিল। কোলকাতা থেকে আবার যেতে হল।

দেশের বাড়িতে গিয়ে দেখি ঐ বিয়েকে কেন্দ্র করে বেশ একটা গুঞ্জন চলছে। অন্য কোন কারণে নয় ভুরি ভোজনের মোক্ষম এক সুযোগ বলে।

ঐ বিয়ের ব্যাপারেই কোলকাতা থেকে আমি গ্রামে পৌঁছেছি কথাটা এপাড়া-ওপাড়া রাষ্ট্র হয়ে গেল। পরের দিন সন্ধ্যার পর গ্রামের মাথা মাথা লোককে এবং পাত্র-পাত্রীর পক্ষে ওদের সমাজের মোড়ল অর্থাৎ কর্তাব্যক্তিদের পুরনো কাছারি বাড়ীতে উপস্থিত থাকার অনুরোধ জানানো হল।

সে এক অপূর্ব সমাবেশ। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ সুবর্ণ বণিক, গোপ সদগোপ ও তন্তুবায় শ্রেণীর বিশিষ্ট ভদ্রলোকরা, অপরদিকে তপসিল-শ্রেণীর লোকেরা।

পাঁজিপুথি দেখে বিয়ের দিন স্থির হওয়ার পর আমি সমবেত জনতার সামনে উঠে করজোড়ে প্রস্তাব জানালাম—গরিবের বিয়েতে প্রথমে চাই আপনাদের সকলের আশীর্বাদ। তারপর আমার নিবেদন আমার পুকুরের মাছ, আমার জমির ধানের চাল, আমার সব্জি মাঠের সব্জি নিয়ে আপনারা নিজেরা হাজির থেকে আপনাদেরই তত্ত্বাবধানে খাওয়া দাওয়ার আয়োজন করুন এবং সঠিকভাবে পরিবেশনের ব্যবস্থা করুন যাতে কেউ-ই অসন্তুষ্ট না হয়। এ কথার সঙ্গে সঙ্গে জোর হাত-তালি পড়ে গেল। আমি আবার প্রস্তাব দিলাম তিনটি ক্লাবের সব

সদস্য হাজির থেকে তালিকা প্রস্তুত করে আমাকে দিন আমি আপনাদের চাহিদামত সব পূরণ করব। এরপর তপসিলী সম্প্রদায়ের দিকে তাকিয়ে দেখি সকলে খুশি, তবে কিসের যেন অভাব বোধ করছে তারা, কিন্তু নিশ্চুপ। প্রস্তাব দেওয়ার মত সাহস কারো নেই। এবার তপসিলী-দের দিকে হাত বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করলাম—তোমরা সকলেই ভোজ খাবে—আর কিছু বলার আছে? দেখলাম কয়েকজন মাথা চুলকিয়ে বলার চেষ্টা করলেও সম্ভব হচ্ছে না। বাবা পাশেই বসে আছে বলে আমিও ইতস্তত করছিলাম কিন্তু মানুষকে খুশি করার যে মনোবৃত্তি মা আমাকে শিখিয়েছে তার একটা প্রেরণা মনের কোণে উঁকি দিচ্ছিল। আমি বলেই ফেললাম। 'হাড়িয়া' (বিশেষ ধরনের গ্রাম্য পদ্ধতিতে তৈরি মদ) পেলে তোমরা খুশি হও?

সরকারি লাইসেন্সপ্রাপ্ত কোন দোকান থেকে তোমরা সংগ্রহ করতে পার—সবটাকা আমি দেব কিন্তু তোমাদের সম্প্রদায়ের কর্তাব্যক্তিদের গ্যারান্টি দিতে হবে মদ খেয়ে কেউ যাতে মাতলামি করতে না পারে।

ওদের কর্তাব্যক্তিরা ঐ সুযোগই চাচ্ছিল। ওরা উঠে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করল, কেউই মাতলামি করবে না। নির্দিষ্ট পরিমাণের বাইরে মাত্রাছাড়া কাউকে দেওয়া হবেনা।

উত্তম প্রস্তাব। মেনে নিলাম, জয়ধ্বনি দিতে দিতে তারা গাজনে নাচার মতই মনের আনন্দে নাচতে নাচতে চলে গেল। বাকি লোকেরা একে একে নমস্কার জানিয়ে বিদায় নিল।

নির্দিষ্টদিনের দু'একদিন আগেই বিয়ের সাজপোশাক ছাড়াও প্রয়োজনীয় সবকিছুই সংগ্রহ করলাম আমাদের পূর্বতন নায়েববাবুর সহযোগিতায়।

শুভদিনের শুভলগ্নে বিয়ে হয়ে গেল। বাবা, মা ও আমাকে সেদিন শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ জানাতে পাঁচিদের বাড়িতে যেতে হয়েছিল। আমাদের দেওয়া জায়গাতেই আমাদেরই টাকাতে তৈরি ঘরে ওরা বাস করছিল, বিয়ের পর আরও একখানা ঘর করে দেব ওদের জানালাম।

চারিদিকে জয়ধ্বনি। সকলের প্রণাম নিতে মা-বাবা কাহিল। আমাদের ফিরে আসার ব্যবস্থা কয়েছিল ওরাই।

পাঁচির বিয়ের একবছর পর ওর মা মারা গেল। দু বছর পর পাঁচির একটা পুত্র সন্তান হল। ও নিজেব সংসারে জড়িয়ে পড়ল। ওর স্বামী আমাদের খামারে কৃষাণের কাজ করলেও পাঁচি আর মার কাছে দিবারাত্র সার্ভিস দিতে পারে না। তার কারণ তার ছেলের অসুখ বিসুখ লেগেই থাকে। মা-বাবাকে দেখার জন্যে পাঁচির মত কোন গরিবের মেয়েকে আর পেলামও না। এদিকে কোলকাতায় আমার ব্যবসাও রমরমা। ঘনঘন দেশে যাওয়া-আসাও আমার পক্ষে অসুবিধে। তাই বাবা মাকে কোলকাতা নিয়ে চলে এলাম—বাড়ি ঘরে তালাচাবি লাগিয়ে। জমিজমা পুকুর পুষ্করিণীর ফসলাদি বুঝে নেওয়ার দায়িত্ব দিয়ে এলাম জেঠতুতো দাদাকে।

মা চলে আসার দিনে পাঁচির কান্না দেখে লোক অবাক হয়ে গেল—যেন আত্মার আত্মীয় আত্মা ছেড়ে সুদূরে চলে গেল।

পাঁচিকে ঠিকানা লিখে দিয়ে এসেছিলাম। ক্লাবঘরে গিয়ে সে চিঠি লিখিয়ে নিত এবং ডাকঘরে ফেলত। মা চিঠির জবাবও দিত। দীর্ঘদিন বাবা মাকে আর দেশে পাঠাইনি। উভয়েই হাইপ্রেসারে ভুগছিল। দশবছর পব মা মারা গেল। বাবা আরও দু বছর পব।

এরমধ্যে আমার বিয়ে সাদি হয়েছে সন্তানাদিও হয়েছে। ব্যবসা আর ফ্যামিলি নিয়ে এতই বিব্রত ছিলাম যে ইচ্ছে থাকলেও আর স্বদেশে যাওয়ার সুযোগ ঘটত না। জেঠতুতো দাদা এসে সম্পত্তির ফসলাদির টাকাকড়ি দিয়ে যেত। সকলের খোঁজখবর নিয়ে যেত। বৌদিও আসত।

* * *

দিন চলতে থাকে একের পর এক করে। তার পিছনে পড়ে থাকে কত ইতিহাস। বাবা-মা গত হওয়ার পরও প্রায় বিশ বছর কেটে গেল। গ্রামের বাড়িতে যাওয়া হতো না। তার করণ হাই ব্লাডপ্রেসারে ভুগছিলাম দীর্ঘদিন। একসময় হাসপাতালেও ভর্তি হতে হয়েছিল।

ডাক্তারের নির্দেশ মত আজও আমাকে চলতে হয়। এর পর স্ত্রীর হার্ট অ্যাটাক হল। চিকিৎসার গুণে এখন অনেকটা সুস্থ। তিন ছেলে দিল্লিতে ব্যবসা করে, একছেলে কোলকাতায় আমাদের পরিচর্যায় নিযুক্ত।

জেঠতুতো দাদার চিঠি পেলাম জমিজমা নিজের নামে রেকর্ড না করালে যৌথভাবে আর বাখা যাবে না। অতএব রেজেষ্ট্রি পার্টিশন দলিল করা চাই এবং সেটেলমেণ্টে ঐ দলিল জমা দিয়ে পর্চায় নিজের নিজের নাম বসানো চাই তবে সরকারে গ্রাহ্য হবে।

অগত্যা একবার দেশে আসার কথা দাদাকে জানিয়ে দিলাম এবং পাঁচিকেও। ঠিক বত্রিশ বছর পর আমার দেশে পুনরাগমন।

দাদার ও পাঁচির পত্র পেলাম। নির্দিষ্ট দিনের অমুক ট্রেনে দাঁইহাট স্টেশনে নামছি বলে জানিয়ে দিলাম। দাদা লিখল—'আমরা খুশি তুমি এস।' 'পাঁচি লিখল 'স্টেশনে আমরা আনতে যাব।'

নির্দিষ্ট দিনের নির্দিষ্ট ট্রেনে নেমে আমার পোর্টেবল ব্যাগটা হাতে করে প্লাটফর্মের একটা বেঞ্চে বসলাম। ঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না পাঁচির তরফ থেকে স্টেশনে কে আমাকে নিতে আসবে। দাদাকে স্টেশনে আসতে হবে না লিখেছি—পাঁচির ছেলে আছে জানি, কিন্তু সে কি আমাকে চিনবে? এ সব চিন্তা করছি—এমন সময় পঞ্চাশোর্ধ বয়স্কা, চশমা পরিহিতা এক বৃদ্ধা, পিছনে দুই বিবাহিতা মহিলা আমার কাছ বরাবর এসে কি যেন চিন্তা করছিল। আমি মনে করলাম ওরা বুঝি বসতে চায় বেঞ্চে, তাই আমি নিজেকে সামলে বসলাম। হঠাৎ পাঁচি বলে উঠল 'মেজবাবু'। গলার স্বর শুনে সোজা হয়ে বসলাম, বললাম, কাকে চাচ্ছেন?

একথা বলার অর্থ সে পাঁচি আর নেই। কেতাদুরস্ত ইস্ত্রিকরা মূল্যবান শাড়ি তার পরনে, চোখে চশমা, সামনের দাঁত দুটোতে সোনার মোড়ক। পায়ে মূল্যবান চটি। সে যে পাঁচি হতে পারে এ-তো ভাবা যায় না—তা ছাড়া এই বত্রিশ বছরে তার শারীরিক পরিবর্তন সাংঘাতিক। পুনরায় বললাম,—কাকে চান?

আমার গলার স্বর শুনে পাঁচির সন্দেহ দূর হল। সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করল পাঁচি, সঙ্গে সঙ্গে বিবাহিত দুই মহিলাও। পাঁচি ডুকরে কেঁদে উঠে বলল, আমি পাঁচি।

আমি আনন্দে আত্মহারা। চোখের জল রোধ করা দুঃসাধ্য। পাঁচির হাতটা ধরে পাশে বসালাম, তার পাশে বসল মহিলাদ্বয়। কান্না থামিয়ে পাঁচি কথা বলবে কি, আমার মা বাবার জন্যে আবার কেঁদে উঠল। আমারও গণ্ডবেয়ে সমানে অশ্রু ঝরতে লাগল। একটু পরে ওকে শান্ত করলাম। পাঁচি একে একে সব কথা বলতে লাগল। পাঁচির স্বামী বেঁচে নেই, ছেলেরা পাঁচিকে শান্তিতেই রেখেছে। পাঁচির দুই ছেলে। দুজনেই হাইস্কুলে পাশ করে সরকারি চাকরি পেয়েছে। একজন সেটেলমেণ্টে, একজন বিডিও অফিসে। সঙ্গের মহিলাদ্বয় তারই দুই পুত্রবধূ। ওদেরও একটা করে সন্তান। পাঁচির ছেলেরা পাকা বাড়ি করেছে। কল পায়খানা বাথরুম, বাড়িতে ইলেকট্রিক—টিভি আছে গ্রামের সর্বত্রই ইলেকট্রিকে ঝলমল করে। 'আপনার কোন অসুবিধে হবে না। তাছাড়া আপনার দাদার কাছ থেকে চাবি চেয়ে নিয়ে আপনার ওপর নিচের যাবতীয় ঘর জন মজুর লাগিয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে রেখেছি। সানবাঁধানো পুকুর ঘাট পরিষ্কার করে রেখেছি ফুলের টব সাজিয়েছি। আপনি চলুন আপনি আপনার মেয়ে পাঁচির বাড়ি এসেছেন।' এসব শুনে মনে হল, হয় আমি স্বপ্ন দেখছি নয়তো বত্রিশ বছর পর কবর থেকে উঠে আসছি। পাঁচির এক পুত্রবধূ সন্দেশের প্যাকেট আর এক পুত্রবধূ ডাব কেটে নিয়ে এল। ওরাও ইস্কুল ফাইন্যাল পাশ করেছে। খুব পরিষ্কার দেখতে, পোশাক আশাকও মনের মত। সম্পর্কে আমার নাতবৌ।

আমি বললাম 'দিদিভাই সকলে একসঙ্গে খাব। পাঁচিকে বললাম, নে সন্দেশ খা। সকলেই খেলাম। আমার মনে হল তীর্থক্ষেত্রে নামলাম।'

সেখান থেকে উঠে এসে মিষ্টান্নের দোকানে দুই প্রস্থ মিষ্টান্নের হাঁড়ি

নিলাম। একপ্রস্থ দাদার বাড়ির জন্যে। আর এক প্রস্থ পাঁচির নাতি নাতনিদের জন্যে।

ব্যাগ ব্যাগেজ মিষ্টান্নের হাঁড়ি সাইজ করে সকলে ভ্যান গাড়িতে উঠব—কোথা থেকে সাইকেলে ত্বই যুবক এসে হাজির হল। ত্বজনই পাঁচির ছেলে। পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে বলল, 'দাত্ব ভাল আছেন ?'

ত্বজনকে ত্বপাশ থেকে বুকে জড়িয়ে ধরলাম। পাঁচি তখন চোখ মুচছে।

ওরা ত্বভাই মালপত্র উঠিয়ে দিল ভ্যানগাড়িতে। আমরা উঠে বসলাম। ত্বভাই সাইকেলে চেপে ত্বপাশ দিয়ে চলতে লাগল, ওদের দাদুর যেন কোন অস্থবিধে না হয়!

পাঁচির ত্ব ছেলের নাম স্বপন ও তপন। এখন ষ্টেশন থেকে গ্রামের পাশ দিয়ে বাস চলে, পাকা রাস্তা। বাস রাস্তা থেকে গ্রামে যাতায়াতের পৃথক রাস্তা হয়েছে। ভ্যানে যেতে কোন অস্থবিধেই হয়নি। ভ্যান গ্রামে পৌছতেই লোকের ভিড়। প্রথমে দাদার বাড়ি ঢুকে দাদা বৌদি-কে প্রণাম করলাম। দাদার ছেলেমেয়েরা এবং পুত্রবধূরা এসে আমাকে প্রণাম করল। সকলকে আশীর্বাদ করে বৌদিকে অনুরোধ করলাম, আমার অপরাধ না নিতে। পাঁচিদের বাড়ি যাব। ওখানেই খাব। বিকেলে আসব এবং এরপর এখানেই খাব। দাদা বললেন, ঠিক আছে, নিশ্চয় যাবে। বৌদির হাতে মিষ্টির হাঁড়িটা ধরিয়ে দিয়ে আবার ভ্যানে বসলাম তখন স্বপন তপন ঘর সাজাতে নিজেদের বাড়িতে চলে গেছে। একটু পরে আমরাও পৌছলাম।

দাস পাড়ার আবাল বৃদ্ধ বনিতা হাজির। পাড়ার কুলবধূরা, যুবক-যুবতীরা আমার নাম প্রায়ই শোনে পাঁচির মুখে, আমাকে দেখেনি কখনও তাই তাদের ভিড়। পুরনো লোকদের মধ্যে গণেশ ও ক্ষুদিরামকে চিনতে পারলাম। দাস পাড়াতে ইলেকট্রিক, পাকাবাড়ি রাস্তাঘাট স্থন্দর। স্বপন তপনের বাড়ি অতীব স্থন্দর, আসবাবপত্র মনোরম। প্রাণটা ঠাণ্ডা হল। মনে পড়ল আমার মা, বাবার মুখ। পাঁচির বিয়ের দিন তাদের

এ বাড়িতে এনেছিলাম তখন টিনের ছাপরা চালাঘর। আর এখন ছাদে ফুলবাগান, টিভির অ্যান্টেনা। ভাবা যায়?

আজ আমার মা তার খেলার সাথী পাঁচির বাড়িতে বেড়াতে এলে হয়ত এখানে বেশ কিছু দিন থেকেই যেত। মা, বড়ু চণ্ডীদাসের লেখা 'সবার ওপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।'---কথায় কথায় প্রায়ই উচ্চারণ করত। মানুষের মধ্যেই দেবতা ছদ্মবেশে থাকেন---এটাই ছিল মার ধারণা।

এখন আমার মা যদি বেঁচে থাকতো এবং এদের এখানে আসত তাহলে এরা তাকে দেবীর আসনে প্রতিষ্ঠিত করত, তাতে আমার কোন সন্দেহই নেই। আমি পেঁাছনোর পর আবাল বৃদ্ধ বনিতার ভিড় দেখে মনে হল ওরা কোন গুরু মহারাজকে দর্শন করতে এসেছে।

মানুষ মানুষকে আপন হৃদয়ে স্থান দিলে সে মানুষ মানুষেরই দেবতারূপে পূজিত হয়। সে দিনের উপচে পড়া মানুষের ভিড় দেখে আমার অন্তরে সেটাই ফুটে উঠেছিল "সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই"—কথাটা রন্ধ্রে রন্ধ্রে উপলব্ধি করলাম সেদিন।

ভিড় কমতে বেশ সময় লাগল। প্রথমে স্নান পর্ব সেরে নিলাম। কাপড় পাল্টে এসে দেখি লুচিমিষ্টি তরকারি টেবিলে সাজানো। পাঁচি পাহারা দিচ্ছে। নাতবৌরা পরিবেশনের উদ্দেশ্যে দাঁড়িয়ে আছে। সেই মুহূর্তে স্বপন তপন পুকুরে জাল ফেলে এক বিরাট কাতলা ধরে ফেলেছে। আতিথ্যেয়তার মুগ্ধ আমি পুরনো স্মৃতিকে আশ্রয় করে মা-র চিন্তায় দগ্ধ হচ্ছি।

ওদের আহ্বানে খেতে বসলাম। পাঁচি উঠে দাঁড়াল। খাওয়া চলাকালীন পাঁচি বলল, 'বাবা কোন কিছু অসুবিধে মনে হলে আমাকে বলতে ইতস্তত করবেন না। জবাবে বললাম, 'আমার নিজের বাড়িতে অসুবিধে বোধ' করব কি? কেউ না জানে তুই তো জানিস এবাড়ি আমার' তুই অস্বীকার করতে পারিস। তোর যখন বিয়ে দিই তখনও এটা আমারই বাড়ি ছিল তাহলে এখন থাকবে না কেন? আর তুই ছিলি তখনও আমার মেয়ে. এখনও আমার মেয়ে। আমি আমার মেয়ে-

কে দান করেছি মাঝখান থেকে তোর পুত্রবধূরা দখল নিয়ে আমাকে শাসাচ্ছে—কি করি বল্।' এ সময় নাতবৌদের প্রাণখোলা হাসি দেখে হৃদয় গলে গেল।

একজনের মন্তব্য : 'দাদু খুব রসিক তো? আমাদের শখ দিদাকেও এনে একসঙ্গে আপনাদের সেবা করি। দাদু সে সুযোগ আমাদের দেবেন না?'

পাঁচির মন্তব্য : মাকে আমি কখনো দেখিনি। পাড়া-গাঁ যত্ন হবে না বলে বাবা কখনও মাকে নিয়ে আসেননি। নাতবৌদের সমস্বরে আবদার আমরা যেমন করেই হোক তাঁকে আর দাদুকে এরপর নিয়ে আসবই।'

বললাম, 'বেশ আনবে। পাঁচির নাম সে জানে। প্রায়ই গল্প করি। কিন্তু ওকে কখনও দেখেনি। আমি সঙ্গে করে নিয়ে এলে সে অবশ্যই আসবে।'

পাঁচি জোর ধরল—আনতেই হবে। তার পুত্রবধূরা শুনে খুব খুশি হল যখন বললাম, তার আগে তোদের চিঠি দিয়ে জানাব।

এরপর ওরা আমার বিশ্রামের সুযোগ করে দিল। ঘণ্টা দুয়েক ঘুমিয়ে নিলাম। তারপর দেখি খাবার জন্য টেবিল সাজাচ্ছে। সে রাজকীয় আয়োজন। খাবারের তালিকা শোনালে জিবের জল আটকানো পাঠকের পক্ষে কঠিন হবে তাই ওদিকে গেলাম না।

সন্ধ্যার পূর্বে নাতবৌ ও নাতিদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে দাদার বাড়ি এলাম, সঙ্গে এল পাঁচি ও পাঁচির দুই ছেলে। ওরা অনেকক্ষণ বসে গল্পগুজব করে চা-টা খেয়ে চলে গেল। পাঁচি রাত অবধি রইল আমি খাওয়া-দাওয়া সেরে নিজের ঘরে শুতে গেলাম—সঙ্গে গেল পাঁচি। দোতলার প্রশস্ত ঘরে বাড়ি সংলগ্ন বাগান ও পুকুরের দিক থেকে প্রবাহিত মৃদু মন্দ হাওয়ায় বেশ সুখ নিদ্রাই হবে। আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ। একটু পরে দেখছি স্বপন ও তপন হাজির। দাদার বাড়ি থেকে বালিশ, বিছানার চাদর সবকিছু আগেই এসেছে। স্বপন তপনও এনেছে। ওরা আমার প্রশস্ত ঘরের একদিকে নিজেদের বিছানা করে

নিল। পাঁচি বলল, তোমাদের দাদুকে একলা থাকতে দেব না। মন খারাপ করবে। তাই তোমাদের আসতে বলেছি। সকলের শোয়ার ব্যবস্থা দেখে পাঁচি চলে যাবার উপক্রম করল। ওকে হাসাবার জন্যে বললাম, পাঁচি সেই তাল চোরের ঘটনাটা তোর মনে পড়ে? পাঁচির কি হাসি। বললাম, যা বাড়ি গিয়ে নাতবৌদের কাছে ঘটনাটা শুনিয়ে দে।

পাঁচি চলে গেল। আমরা পুকুরের দিকের বারান্দায় তিনখান চেয়ার টেনে এনে বসে গল্প করতে লাগলাম।

পরদিন দাদার সঙ্গে কাটোয়া শহরে গিয়ে সম্পত্তির বণ্টননামা রেজেষ্ট্রি করলাম এবং সেটেলমেণ্ট অফিসে গিয়ে নাম পত্তনের জন্য দরখাস্ত করলাম।

তারপরও দুদিন থাকতে হল। কোলকাতা ফেরার প্রাক্কালে সকলের চোখের জলের এক চুম্বকীয় আকর্ষণ আমাকে মায়াজালে আবদ্ধ করল। আমার স্ত্রীকে নিয়ে পুনরায় আসবার কথা আদায় করে নিয়ে তবে তারা আমাকে ছাড়ল।

কোলকাতা ফেরার ক'দিন পরই পাঁচির পত্র পেলাম। পত্রের শেষে লিখেছে ইতি আপনার কন্যা পাঞ্চালি।

চিঠিটা পড়ে স্ত্রী বলল, 'পাঁচি নামে যে মেয়েটার খুব গল্প কর পাঞ্চালি কি সে ই।

আমার স্ত্রীকে রাগাবার উদ্দেশ্যে বললাম, পাঞ্চালি আমার প্রথম পক্ষের মেয়ে।

প্রথম পক্ষ? বলেই সে হতাশ হয়ে পড়ল। ও হার্টের রোগী, খেয়াল হতেই কথাটা ঘুরিয়ে নিয়ে বললাম—তোমাকে রাগাবার জন্যে বললাম, মার কাছ থেকে যে পাঁচির গল্প শুনতে, এ সেই পাঁচি। ভাল নাম পাঞ্চালি।

স্ত্রী দীর্ঘশ্বাস ফেলল, তাকে বললাম, তোমাকে বেড়াতে নিয়ে যেতে বলেছে। তুমি যাবে?

সঙ্গে সঙ্গে জবাব—হ্যাঁ যাব। আমার শ্বশুর-শাশুড়ির ভিটেটা,

দেখতে যাব। কতবার তোমাকে বলেছি। তোমারতো সময়ই হয় না। কেন যে নিয়ে যাওনা, বুঝতে পারি না। এবার আমি যাবই।

—কবে যাবে বল।

—যেদিন নিয়ে যাবে।

তাহলে পাঁচিকে চিঠি লিখি।

—লেখ।

'মাসখানেকের মধ্যে তোর মাকে নিয়ে বেড়াতে যাব, পরের পত্রে দিনটা এবং স্টেশনে নামার সময়টা জানাবো'---বলে পাঁচিকে পত্র দিলাম।

যথাসময়ে পত্রের জবাব পেলাম। তাতে স্বপন তপন ও ওদের দুইবৌ এর সই রয়েছে। তাতে আবদার করেছে দিদিমাকে অবশ্য অবশ্য আনা চাই।

পরের চিঠিতে দাদাকে ও পাঁচিকে জানিয়ে দিলাম আমার স্ত্রীকে নিয়ে কবে কোন সময় স্টেশনে নামছি।

নির্দিষ্ট দিনে নামলামও। দাদার ছেলেমেয়েরা পাঁচির ছেলেরা পুত্রবধূরাও এমনকি স্বপন তপনও স্টেশনে অপেক্ষারত।

সেবারকার মত এবারও প্রথমে দাদাদের বাড়িতেই উঠলাম। পরের দিন পাঁচিদের বাড়িতে যাব। তাতে তাদের আপত্তি নেই।

পরের দিন ওকে নিয়ে পাঁচিদের বাড়ি গেলাম। আতিথেয়তা দেখে সে হতবাক। সেদিন পাঁচিদের ওখানেই খাওয়া-হল। বিকেলে পাঁচি সঙ্গে করে দাদার বাড়িতে পৌঁছে দিল। দাদা বাগানবাড়ির চাবিটা পাঁচির হাতে দিয়ে বলল, 'বাগানবাড়িটা ঘুরিয়ে দেখিয়ে আন।' কত রকমের ফলের গাছ। কত ঝুলন্ত পাকা ফল। পাকা মর্তমান কলার কাঁদি কাটল দাদার ছেলে। এক কাঁদি ডাব পাড়া হল, পাকা আনারস, বাতাবি লেবু। সব শেষে স্ত্রীর মনের মত ফল—কয়েত বেল। পাকা পাওয়া গেল। কি খুশি। কতশত ঝুলতে দেখে বলল, কোলকাতা যাবার সময় একথলি নিয়ে যাব। বললাম বেশ।

পরের দিন সানবাঁধানো ঘাটে দুটো চেয়ার পেতে আমাদের দুজনকে বসতে দিল। সে সময়ের জেলে ছিল ভক্ত নামে একজন। এখন সে

বেঁচে নেই। তাই ভক্তের ছেলে এসেছে মাছ ধরতে। ঘাটের অপর পাড়ে হরেকরকম গোলাপ ও রজনীগন্ধার চাষ।

একসঙ্গে জালে অত মাছ ছটফট করতে দেখে খুবই আনন্দ পেল আমার স্ত্রী। পাশে পাঁচি দাঁড়িয়ে ছিল। সে ঘাটের কিনারায় গিয়ে ছেলেটার নাম ধরে ডেকে বলল, সবচেয়ে বড় কাতলাটা আজ ধর। কাল রুই ধরবি যদি গলদা চিংড়ি জালে পড়ে—মোটে ছাড়বি না। ছেলেটা বলল, বেশ।

পাঁচদিন থাকার পর ফিরে আসার চেষ্টা করছি—আমার দাদা বৌদির জিদে, তাঁর ছেলেমেয়েদের অভিমানে, পাঁচি ও পাঁচির পুত্র পুত্রবধূদের মান-অভিমানে বাধ্য হয়ে স্ত্রীকে রেখেই আমাকে ফিরতে হল। কোনসময় দিল্লি থেকে কোন্ ছেলে এসে যায়। বাবা-মাকে না পেয়ে ফিরে যায় এই ভয়ে আমাকে ফিরতে হল।

একমাস পরে ওকে আনতে গেলাম। সে ওখানে জমে গিয়েছে। তার কোন রোগব্যাধিই নেই। শহরের একঘেঁয়েমি শাসরুদ্ধ আব-হাওয়ায় অতিষ্ঠ। সে একেবারে বলে দিল দিল্লি থেকে ছেলেরা এলে সরাসরি ওখানে আনতে। ভাইপোরা টিভি দিয়েছে। পড়ার মত বহুবই সংবাদপত্র। ম্যাগাজিন, কোন কিছুরই অভাব নেই। নিজেদের বাগানের ফল, নিজেদের গাই গরুর দুধ, দই ছানা, রাবড়ি পুকুরের মাছ, এ হেন দলবল ফেলে সে আর কলকাতা ফিরে যাবে না।

আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ—প্রাসাদ সংলগ্ন দীঘির সানবাঁধানো ঘাটে বসে আমি আমার স্ত্রী ও পাঁচি মৃদুমন্দ স্নিগ্ধ হাওয়ার ভরপুর আমেজ উপভোগ করতে করতে এ সব কথা আলোচনা করছিলাম। কি যেন চোখে পড়ায় আমার স্ত্রী কয়েক ধাপ সিঁড়ি থেকে জলের কিনারায় এসে আমাদের ডাক দিল। ছুটে গিয়ে দেখি একটা বৃহদাকার বোয়াল মাছ অন্য একটা মাছকে তাড়া করায় সে লাফ দিয়ে—একধাপ ডাঙ্গায় উঠে পড়েছে। বোয়ালটাও নাছোড়বান্দা। কিন্তু আমার স্ত্রীকে দেখতে পেয়ে বোয়ালটা জলে নেমে গেল। স্ত্রীও ভয় পেয়ে দু ধাপ ওপরে উঠে এসেছে। আত্মরক্ষাকারী মাছটা জলে ডুবে থাকা একটা সিঁড়ির গা বেয়ে

লুকিয়ে পড়ল। আমার স্ত্রীর আনন্দ দেখে প্রথমটা আমি স্বর্গীয় সুখ উপলব্ধি করছিলাম কিন্তু পরক্ষণেই বিষাদের ছায়া নেমে এল। পাঁচি বা স্ত্রী জানতে পারল না। পাঁচি আমার স্ত্রীর হাত ধরে সিঁড়ি বেয়ে ওপর দিকে উঠে এসে বসল। আমি জলের কিনারায় বসে অশ্রুবর্ষণ করার পর চোখ মুখটা ধুয়ে অন্তরটাকে পরিষ্কার করে তবে ওপরে উঠে এলাম।

উল্লেখ্য, অনুরূপ ঘটনা ঘটেছিল ন্যাড়া বৌদিকে নিয়ে আর একদিন। সেখানে তখন রাঙা বৌদিও ছিলেন। একটা বড় মাছের তাড়া খেয়ে দু তিনটে মাছ প্রাণভয়ে ডাঙ্গায় উঠে পড়েছিল। তাদের দুটোকে ধরে ন্যাড়া বৌদি আদর করে তাদের গায়ে হাত বুলিয়ে সোহাগ করে জলে ছেড়ে দিয়েছিল। স্মৃতিপটে সেই দৃশ্য উদ্ভাসিত হওয়ায় অশ্রু সংবরণ করতে পারছিলাম না। বুকের পাঁজরটা যেন গুঁড়িয়ে যাচ্ছিল। অনেক চেষ্টা করে অশ্রু সংবরণ করলাম এবং ওদের দুজনকে কোনকিছু জানতে না দিয়ে চোখ মুখ ধুয়ে ওপরে উঠে এলাম।

পরদিন দিল্লি থেকে আমার তিনছেলে কোলকাতা এসে বাবা মাকে দেখতে না পেয়ে আমার দেশের বাড়িতে হাজির। তারা আমার স্ত্রীর চিঠি পেয়েছিল সবকিছুর বর্ণনা সহ। জীবনে প্রথম তারা দেশের বাড়িতে হাজির হল।

আমার দাদা আমাদের বাড়ির সব চাবিই আমার হাতে দিয়ে দিয়েছিল।

বিশ্রাম শেষে আমার ছেলেরা দাদু-দিদার স্মৃতি বিজড়িত অনেক কিছু খুঁজতে খুঁজতে একটা পরিত্যক্ত আলমারীর নিচের তলা থেকে সযত্নে রক্ষিত মোড়ক সুদ্ধ সেই শালটা বের করে এনে আমার হাতে দিয়ে জানতে চাইল এটা নিশ্চয়ই তাদের দাদু গায়ে দিতেন। তৎ মুহূর্তে আমার মনে হল যেন ভূমিকম্প হচ্ছে, এই মুহূর্তে ঘূর্ণি ঝড়ের দাপটে আমার প্রাসাদ চূর্ণ বিচূর্ণ হবে। সে সময় ভীষণ ভাবে আমার মাথা ঘুরছিল। পাঁচিকে বললাম আমায় ধর খাটে শুইয়ে দে, মাথায় জল দে। এরপর আর কিছু মনে নেই।

জল ঢালা হয়েছে প্রচুর। যখন জ্ঞান ফিরল দেখলাম সনৎ ডাক্তার আমার নাড়ি পরীক্ষা করছে। দাদা-বৌদি, ভাইপো, ভাইঝি সব হাজির। ছেলেদের চোখে জল, স্ত্রী পায়ের তলায় হাত দিয়ে বসে আছে। অনর্গল তার অশ্রু ঝরছে আমার পায়ের ওপরে। আমি প্রকৃত পক্ষে জ্ঞান হারাইনি। বাক্‌রোধ হয়েছিল সাময়িকী। সুস্থ হয়ে উঠে বসে শালের কাহিনী বলতে সবে শুরু করেছি। আবার কিছু একটা ঘটতে পারে ভেবে সনৎ একটা ঘুমের বড়ি খাইয়ে দিল। কয়েক ঘণ্টা পর ঘুম থেকে উঠলাম।

সন্ধ্যার পর ছাদে বসে আমার ছেলেরা আমার স্ত্রী, পাঁচি, পাঁচির ছেলেরা, পুত্রবধূরা, নাতিনাতিনী, দাদা, বৌদি, ভাইপো, ভাইঝিরা হাসি খুশির মধ্যে আমাকে বেশ সতেজ করে তুলল। সনৎ ডাক্তার আবার এসেছে। তাকেও চা-চক্রে আহ্বান জানানো হল।

সনৎ জানতে চাইল—হঠাৎ এমন হল কেন? আপনি হার্টের রোগী আমরা হতাশ হয়ে পড়েছিলাম।

আমি বললাম—সনৎ শোনো, আমি দুঃখ পাব না যদি আমার অন্তরের বেদনার উপশম করতে চাও এবং আমাকে স্বস্তি দিতে চাও তাহলে ধীরে ধীরে সব কথা বলতে দাও। সবাই উৎকর্ণ হয়ে পাশা-পাশি চেয়ার টেনে, বলল ব্যাপারটা কি!

আদ্যোপ্রান্ত ধীরে ধীরে বর্ণনা করলাম। মন খোলসা হল। তবে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিল মাঝে মাঝে।

পাঁচি বলল, আমি তখন আট / দশ বছরের। জেঠিকে দেখেছি, অনেক তাড়া খেয়েছি। মা-র সঙ্গে যেখানে গিয়ে বসে মুড়ি খেতাম, উঠে আসার পর জেঠি গোবর ছড়া দিত, সেটা সদরের বাইরে ঠাকুর বাড়ির সীমানায় পড়ে। সদরে ঢোকার অধিকার কারো ছিল না। পাঁচি ন্যাড়া বৌদির কথাই বলছিল।

আলোচনা শেষে সকলকে জানিয়ে দিলাম যদি আমাকে শান্তিতে রাখতে চাও তাহলে ন্যাড়াবৌদির স্মৃতি-বিজড়িত ঐ শালটা সবসময় আমার বিছানার পাশে থাকবে। ঐ শালটা কাছে থাকলে আমি

আমার ন্যাড়াবৌদির সঙ্গে স্বপ্নে কথা বলতে পারব, যেমন প্ল্যাঞ্চেটে কথা বলে। ঐ শালটাকে কেন্দ্র করেই তার সঙ্গে আমার ঝগড়া এবং সেই ঝগড়াই তার সঙ্গে শেষ কথা। সে আঘাত সহ্য করতে না পারায় তার হার্ট অ্যাটাক হয় এবং তার ফল মৃত্যু—এসব কথা আমার স্মৃতিপটে দিবালোকের মতই স্পষ্ট। সকলের অভিমত--শালটা সব সময় আমার শয্যা পাশে থাকবে। গায়ে দেওয়ার প্রয়োজন না হলেও, অর্থাৎ গ্রীষ্ম কালেও। আজও আমি সে শাল সযত্নে শয্যাপাশে রেখে চলেছি। কোন লণ্ড্রিতে কাচানো সম্ভব নয়—ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে। সার্ফে ডুবিয়ে রেখে সযত্নে জলসমেত রৌদ্রে মেলে শুকিয়ে নেওয়া হয়।

তারপর যে ক'দিন দেশের বাড়িতে ছিলাম—জ্যোৎস্নাপ্লাবিত চন্দ্রালোকে ছাদের মাঝ বরাবর একটা ক্যাম্পখাটে শুয়ে সুখ নিদ্রা যেতাম —পাশে থাকত আমার প্রিয় শালটি। সকালে উঠে পাঁচি আব আমার স্ত্রী একসঙ্গে এসে শালটিকে যথাস্থানে সযত্নে রাখত আমাকে শান্তি দেওয়াব জন্যে।

একদিন স্বপ্নে দেখছি—ন্যাড়াবৌদি আমার মাথার কাছে বসে তার দুধসাদা ধবধবে দাঁত বের করে আকণ্ঠ-বিস্তৃত হাসি হেসে বলছে 'এই পাগল, আমাকে এখানে ফেলে শহবে পালিয়ে গেলে রেহাই আছে, কেমন কায়দা করে ধরে এনেছি। মায়াময় পৃথিবী—কেমন আকর্ষণ। তোমার বৌটা খুবই ভাল– বেঁচে থাকতে আলাপ হয়নি, ও আর এখান থেকে যেতে চাইবে না, ওকে মন্ত্র দিয়ে বশ করেছি। আমার আত্মা খুব শান্তি পাচ্ছে তোমাদের দেখে। ছেলেদের আমি নিজের হাতে খাওয়াতে পাবছি না এটাই দুঃখ।'

'জানো মেজবাবু, বেঁচে থাকতে ছুঁই ছুঁই করতাম সবকিছুকে। মৃত্যুর পব দেখছি—সবই ভুল। ঈশ্বরের কাছে সব সমান। যত ভেদাভেদ মানুষের কাছে। মানুষই ভেদাভেদ তৈরি করেছে, ভগবান তাই মানুষের ওপর রাগ করেই একদলকে ধনী করেছে, উচ্চ আসন দিয়েছে, আর একদলকে করেছে ভিখিরি, অচ্ছুৎ, অস্পৃশ্য এবং ভগবান নিজে ঐ দরিদ্র নারায়ণদের মধ্যে লুকিয়ে থেকে উচ্চবর্ণ ও ধনীলোকদের পরীক্ষা করে

থাকে। যারা ভগবানকে চিনে নিতে পারে না, দরিদ্রের ওপর অত্যাচার করে, উন্নত-অনুন্নত বলে নাক সিট্‌কোয় ভগবান পরবর্তী যুগে তাদের করে গরিব, আর গরিবদের করে ধনী, সেজন্য কোন বংশ চিরস্থায়ী ধনী হিসেবে থাকতে পারে না—এটাই ভগবানেব লীলা।

তুমি কিন্তু ভুল করো নি। করেনি মা-ও (আমার মা)। তোমরা পাঁচিকে, পাঁচির মাকে, ওদের জাতিকে অন্তরে স্থান দিয়েছ, সমাজকে দেখিয়ে দিয়েছ সব মানুষই ভগবানের সৃষ্টি; তাই তোমার ছেলেরা তোমার বংশধররা, পুণ্যি লাভ কবছে, করবেও—ভগবান ন্যায় বিচারক।'

স্বপ্ন ভাঙতেই মনে হল শ্বেতবসনা এক আলেয়া সুন্দরী ছাদের অপর দিকের কানিশ বেয়ে নেমে গেল হাসতে হাসতে। নির্বাক নিশ্চুপ হয়ে ভোরের হাওয়ায় শালটা বুকে জড়িয়ে ধরে ক্যাম্পখাটের ওপর অনেক-ক্ষণ বসে রইলাম। দূরে আজানেব শব্দ কানে এল, স্ত্রা এসে বলল, চল বাগান দিয়ে বেড়িয়ে আসি, ধীরে ধীরে শালটা ওর হাতে দিয়ে বিছানা ছেড়ে উঠলাম।

মনে হয় স্বপন, তপন দুবেলাই সনৎ ডাক্তারকে আসতে বলেছে নইলে বিনা কলে সে দুবেলাই আসছে কেন? সেদিনই সকাল ৭টায় সে এল। চা খেতে খেতে তাকে বললাম, শোনো সনৎ হার্টের বোগী হলেও এই মুক্ত পরিবেশে আমি ও আমার স্ত্রী ভালই আছি। আমাকে মনের কথা খুলে বলতে দাও, দেখবে আমি সুস্থ আছি। সনৎ হাসল, বলল আচ্ছা বেশ, সন্ধ্যের পর এসে আপনার কথা শুনব, যে কটা দিন থাকেন। বললাম এসো।

ঐদিনই সকাল ন'টায় স্ত্রী ও ছেলেদের নিয়ে একত্র বসে পাঁচির তাল-চোর ধরার বর্ণনা করছি হঠাৎ মোটর সাইকেলে এসে গেল পাঁচির দুই ছেলে স্বপন ও তপন। পাঁচিকে বলল, মা, মামারা দিল্লীতে থাকেন তাই তোমার বৌমাদের ইচ্ছে বর্ধমান শহরে যখন যাচ্ছি, তখন ওখানকার মিহিদানা সীতাভোগ এনে দাদু, দীদা ও মামাদের খাওয়াই। পাঁচির হাসিটা দেখার মত। আমি পকেট থেকে একশো টাকার নোটটা বের করতেই দু ভাই সমস্বরে বলে উঠল—পাশে-বসা আমার স্ত্রীকে দেখিয়ে,

'দীদাকে ওটা বকশিশ দিলে আমরা বেশি খুশি হব' বলেই দুভাই উধাও হয়ে গেল। স্ত্রী আমার মুখের দিকে চেয়ে বেশ প্রসন্ন হাসিই হাসল।

সন্ধ্যার পর সনৎ এল—এল স্বপন তপন ছাড়া আমার ভাইপো ভাই-ঝিরা আর পাঁচিসহ আমরা তো সকলেই আছি। সেদিনও আকাশে চাঁদ রব রব করছে, ঘাটের পাড়ে সান-বাঁধানো আঙিনায় মজলিস বসল—চা-চক্র সমাপ্ত হতেই আমি স্মৃতি মন্থন করে ওদের শোনাতে লাগলাম—

প্রায় পঞ্চাশ বছর আগেকার কথা। তখন আমরা স্কুলের ছাত্র। গ্রামে ভীষণ কাদা হত বর্ষাকালে। এপাড়া থেকে ওপাড়া স্কুলে যাওয়াও ছিল দুঃসাধ্য। এক হাঁটু কাদা। গ্রামে তখন পাকা রাস্তা হয় নি। ছিল না ইলেকট্রিক, সাইকেলও চলত না বর্ষাকালে। আমাদের তিনটে ঘোড়া ছিল। গোমস্তা এগ্রাম-ওগ্রাম ঘুরত খাজনার তাগিদে, বাবার নিজস্ব একটা ঘোড়া আর আমার একটা। আমার বড়দা থাকত দিনাজপুরে। সেখানে আমাদের জমিদারী ছিল।

ঘোড়াগুলোকে মাঠের বড় পুকুরে যেটার জলকর প্রায় ১৮ বিঘার মত—সেখানে ধারে ধারে ধান গাছের মত একধরনের ঘাস গজাত। ফ্যালা নামে একটা চাকর ছিল, যার কাজ ছিল সকালে ঘোড়াগুলোকে ঐ পুকুরের ধারে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দেওয়া, ওরা ঘাস খেয়ে পেট মোটা করলে এক বোঝা ঘাস ওদের পিঠে চাপিয়ে ফ্যালা বাড়ি নিয়ে আসত। বাবা ঘোড়াগুলো পছন্দ করে কিনে এনেছিল পলাশীর নিকটবর্তী বেজিনগর নামক স্থান থেকে। তখন সেখানে ঘোড়া বেচাকেনার হাট ছিল।

ঘোড়ায় চড়ে স্কুল যাওয়া ছাড়াও আমি বিকেলে বেড়াতে বেরোতাম আমার প্রিয় ঘোড়াকে নিয়ে। আমার ঘোড়ার নাম রেখেছিলেন আমার গৃহশিক্ষক—স্বর্গীয় গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। রানা প্রতাপের ঘোড়ার নামে আমার ঘোড়ারও নাম চৈতক। বাবার ঘোড়ার নাম বাহাদুর। নায়েবের ঘোড়ার নাম পলকজয়ী। একদিন বিকেলে মাঠে বেড়াতে বেরিয়েছি, একটা বিরাট গোখরো সাপ বেরিয়েছে, শালিক পাখীরা তাকে দেখে তারস্বরে চিৎকার করছে। কোত্থেকে একটা

বেজি এসে সাপটার সঙ্গে লড়াই বাধিয়ে দিল। চৈতকের লাগাম ধরে শক্ত হয়ে পায়ের ছাঁদটা যাকে রেকাব বলে, টাইট করে ধরে ওর পিঠে বসে এক অপূর্ব দৃশ্য দেখতে লাগলাম। স্বচক্ষে কোন যুদ্ধই দেখি নাই —সেদিন সাপে নেউলের যুদ্ধ দেখে চক্ষু চড়ক গাছ। শেষ রক্ষা হল না। ঘন্টা খানেক লড়াইয়ের পর সাপটার মাথা চিবিয়ে দিল নেউলটা কিন্তু নেউলটারও নাড়িভুড়ি বেরিয়ে গেল সাপের শেষ মোচড়ে। বোধহয় নেউলটা সাপের রেঞ্জের সীমারেখার মধ্যে পড়ে গিয়েছিল। চৈতককে ওদের কাছাকাছি নিয়ে যাবার চেষ্টা করলাম কিন্তু বাগ মানাতে পারলাম না। দুইপাশের লোহার পা-দানি দিয়ে ধাক্কা দিলাম ওর পেটে। হয়ে গেল উল্টো কাণ্ড। বিরক্ত চৈতক পাশের এক বিরাট নালা তাক করে লাফ দিল—আমি ছিটকে পড়ে গেলাম চাষ দেওয়া জমির কাদার ওপর। শুকনো জমি হলে হাড়গোড় ভেঙ্গে যেত। পড়েই রইলাম। বামদিকের পশ্চাৎভাগে আঘাত পেয়েছি। ফ্যালা পুকুরের পর পারে ঘাস কাটছিল ঘোড়ার জন্য—সে ঠিক লক্ষ্য করেনি। আমি পড়ে যাওয়ার পরমুহূর্তে চৈতক এক দৌড়ে ষোলবিঘা পুকুর পাড় অতিক্রম করে ফ্যালার কাছ বরাবর গিয়ে দারুণ চীৎকার আরম্ভ করল— অর্থাৎ কিনা 'বাবু পড়ে গেছে, বিপদ, দৌড়ে এস', ফ্যালা কাস্তে হাতে উঠে দেখল চৈতক চেঁচাচ্ছে কেন ? দেখে, পিঠে বাবু নাই, পরপারে নালার ধারে চষা জমিতে পড়ে আছি। ফ্যালা হাতের কাস্তে ফেলে দৌড়ে এসে আমাকে হাত ধরে তোলার চেষ্টা করছে আমি হাঁটুতেও চোট পেয়েছি। চৈতক এক দৌড়ে আমার কাছে এসে আমার মাথা শুঁকছে এবং নিজের অপরাধের জন্য চোখের জল ফেলছে। আমি চৈতকের চোখে জল দেখেছিলাম। পশুর ভালবাসা তার প্রভুর প্রতি। অপূর্ব অচিন্ত্যনীয়। আমি চৈতকের পা ধরে খুব কষ্ট করে উঠলাম। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছি। ফ্যালা আর সাহস করল না ঐ অবস্থায় চৈতকের পিঠে আমাকে চাপিয়ে বাড়ি আনতে। আমাকে হাত ধরে ডাঙ্গায় এনে বসিয়ে দিল। গ্রামের কোন লোককেও সে পাচ্ছে না যে খবর দেয়। হঠাৎ দেখা গেল উদ্‌ভ্রান্ত চৈতক দৌড়ে বাড়ি চলে গেল, সমস্ত খামার

বাড়িটায় ছোটাছুটি করেছে আর তারস্বরে চীৎকারও। মা দোতলার জানলা দিয়ে লক্ষ্য করে পাঁচির মাকে পাঠায় ফ্যালার খোঁজে। ফ্যালা মাঠে আমাকে একলা ফেলে চলে আসতে সাহস পাচ্ছে না। জল পিপাসাও খুব লেগেছে আমার। কি করি খামার বাড়ির কৃষাণরা মাকে এসে বলল, মেজবাবু নিশ্চয়ই ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে গেছেন, চৈতক পিঠে জিন, মুখে লাগাম নিয়ে ফিরে এসেছে। 'দৌড় দৌড়, দেখ কি হল,' বলে মা উদ্বিগ্ন—ততোধিক উদ্বিগ্ন আমার ন্যাড়াবৌদি, চৈতকও চুপ থাকে নি—পুনরায় একদৌড়ে আমার কাছে এসে মাথা শুঁকতে লাগল। খবরটা চৈতক পৌছে দিয়ে নিজের কর্তব্যবোধেব পরিচয় দিল। আমাকে পাল্‌কি পাঠিয়ে আনা হল—আজ আর ন্যাড়া বৌদি মায়ের শাসন মানেনি—একদৌড়ে গ্রামের শেষ প্রান্তে পাঁচিদের বাড়ির কাছ বরাবর দাঁড়িয়ে থেকে পাল্‌কীর সাথী হল। নিজের শাড়ির প্রান্ত ভাগ দিয়ে আমার মুখমণ্ডলের ঘাম মুছে দিয়ে বেহারাদের ধমক দিল দ্রুত পাল্‌কি নিয়ে যেতে। পাড়ার লোক ভেঙেছে। চৈতক যেন নিজেকে অপরাধীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে বাবা মার কাছ বরাবর দাঁড়িয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে লাগল। বাবা ওর মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, তোর কোন দোষ নেই, ভাবিস না। সে শান্ত হল।

চাকর বাকররা ধরাধরি করে আমাকে দেউড়ির দাওয়ায় নিয়ে গিয়ে বসাল। সর্বাঙ্গ কাদায় ভর্তি। তখন কমল দাদু গ্রামের নামকরা ডাক্তার। কিছুক্ষণের মধ্যে তিনি এসে গেছেন। ন্যাড়া বৌদি ততক্ষণে ধুয়ে মুছে আমার কাপড় পাল্টে দিয়ে ফিটফাট করে ফেলেছে।

দেখেশুনে কমলদাদু বললেন কাদার জমি বলে হাড় ভাঙেনি—আঘাত লেগেছে। হাঁটতে কষ্ট হবে। আমি ইন্‌জেকশন দিয়ে দিচ্ছি। কোন চিন্তা নেই, সপ্তাহ লাগবে সারতে।

প্রতিদিনের মত চৈতক ঠিক সময়েই অন্দরমহলে আসত একবার। ভাতের ফেন, সব্জি তরকারির খোঁসা—তৎসহ বেশ কিছুটা ভাত ও কুঁড়ো এবং ছোলা ভিজে মিশিয়ে তাকে খেতে দেওয়া হত। মা আদর করে বলতো চৈতক পেট ভরল। মাথাটা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে যেত।

ন্যাড়াবৌদির ভয়ে সে দুদিন আসে নি। খামার বাড়ি থেকে সদর দেউড়ির গেট পর্যন্ত এসে ফিরে গেছে। পাঁচির মা সে কথা জানাতেই মার জরুরি আদেশ, ন্যাড়া বৌদি গিয়ে খামার থেকে তাকে যেন সঙ্গে করে নিয়ে আসে। নিয়ে এলও সেদিন। বোঝা গেল চৈতকও ন্যাড়াবৌদির শাসনকে ভয় করেই চলে। সে টুক্ টুক্ করে এসে দাওয়ার ওপর আমাকে বসে থাকতে দেখে কাছ বরাবর গিয়ে শুঁকতে লাগল। মা বলল, চৈতক তুই মেজবাবুকে ফেলে দিয়েছিস—কত লেগেছে বলতো। সে মুখে বলবে কি করে, ভাষা নেই, মাথা নেড়ে অস্বীকার করল, সে ইচ্ছে করে ফেলে দেয় নি। মা-ও তার ভাষা বুঝত—বলল বড় বৌমা খবরদার চৈতককে কিছু বলবে না। ভাতকুঁড়ো মিশ্রিত ফেনের ডাব্বা হাতে নিয়ে ন্যাড়া বৌদি এসে বলল, আয় চৈতক আমার সঙ্গে আয়—তোর কোন ভয় নেই—দৈনিক আসবি কেমন? এইনে খা। মা দেখে খুশিই হল। সেদিন থেকে ন্যাড়াবৌদি পাখিদের বরাদ্দ ভিজে ছোলাও চৈতককে দিতে লাগল। মা জানতে পেরে ছোলার পরিমাণ বাড়িয়ে দিল।

সনৎ ডাক্তার বলল, এর বেশি আজকে আর বলতে দেব না। আগামীকাল শুনব। ঘাটের কিনারায় মাছেরা খেলা করছে গিয়ে দেখুন। সনৎ চলে গেল। আমরা ঘাটের কিনারায় পাথরের তৈরি হাতির শুঁড়ে বসে মাছেদের খেলা দেখতে লাগলাম।

পরের দিন সন্ধ্যার পর অনুরূপ বৈঠক বসল, সেদিন বললাম কান্তি ডোমের কাণ্ডকারখানা। যেখানে চৈতকের পিঠ থেকে আমি পড়ে গিয়েছিলাম তার অপর পাড়ে ছিল আমাদেরই তালবাগান। প্রায় একশোটার মত তাল গাছ। ৬০/৭০টা গাছে তাল আসত। আমাদের জমিতে যারা কাজ করত তারাই তালশাঁস খেত। পাকা তাল তারাই কুড়িয়ে বাড়ি আনত।

কান্তি ডোম আমাদের জমিতে কাজ করত না। অন্যবাবুর জমিতে খাটত। জ্যৈষ্ঠ মাসে বুড়োশিবের মেলার সময় তালশাঁস বিক্রি হত অসম্ভব। কান্তি রাতের অন্ধকারে প্রচুর তাল কেটে পুকুরের জলে

ডুবিয়ে রাখত, রাত্রি অধিক হলে সেসব তাল থেকে শাঁস বের করে মেলায় বিক্রি করত। একদিন সে ধরা পড়ে। আমাদের কৃষাণরা তাকে চোর হিসেবে ধরে কোমরে দড়ি বেঁধে কাছারি বাড়ির থামে বেঁধে রাখে। প্রহারও কিছুটা হয়। মা খবর পেয়ে পাঁচির মাকে দিয়ে খবর পাঠায় যেন ওর গায়ে হাত না দেয়। তার দড়ি খুলে দিয়ে তাকে যেন গোলাবাড়িব কাছে নিয়ে আসে। চোর দেখতে প্রচুর লোক। বাবা সেসময় ঘোড়ায় চেপে কোত্থেকে ফিরে এল। কিছু পরে আমিও চৈতককে নিয়ে ফিবলাম। সে বিরাট সমাবেশ। কান্তির বৌ এসে খুব কাঁদা কাটা করছে। মা কান্তির বৌকে বলল, ভাবিস না ওকে ছেড়ে দেব। তারপর কৃষাণদেব বলল, সব লোককে হটাও। ঠাকুর বাড়ির কাছে যে বড় কুলগাছটা ছিল, (আজও আছে তবে আব ফল দিতে পাবে না) সেখানে তাকে বসিয়ে রাখতে বলে মা কান্তির বৌকে বলল, কোথায় কোথায় মেরেছে পিঠগুলো সরষের তেল দিয়ে মালিশ করে দে। এরপর তোর স্বামী চুরি করতে গেলে তুই নিজেই চেঁচামেচি করে লোক ডাকবি তা নইলে তোকে এনে বেঁধে রাখব। তারপব মা ন্যাড়াবৌদিকে বলল, ওদের চাল আলু সব্জি কি কি আছে দাও ওরা বড় গরিব। খেতে পায় না। ওর বাচ্চাগুলোর দিকে তাকালেই বোঝা যায়। ন্যাড়াবৌদি ভয়ে ভয়ে দিল, সঙ্গে সঙ্গে কান্তির বৌকে জিজ্ঞেস করল তোদের ঘর দিয়ে জল পড়ে—বিচলি দিয়ে ছাওয়া না কি? বৌটা বলল, জল পড়ে সব বিচুলি পচে গেছে। মা বলল, বিচলি নিযে যাবি। বাবা এসে বলল, তোর চুরি করার দরকার হবে না। যদি একটা কাজ করিস, আশেপাশেব জমিগুলোতে সব্জির চাষ হয়। কৃষাণরা রাতে বাড়ি চলে আসে। তুই কুঁড়ে কবে পাহারা দিতে পাববি?

কান্তি বলে, হ্যাঁ পারব। শুনে বাবা বলল, তুই কুঁড়ে বেঁধে নিবি। ওখান থেকে সব্জি তুলে দিবি। তোর দৈনিক মজুরি দেওয়া হবে। তালচুরি ছাড়া পুকুরের মাছ কেউ যেন না ধরে তাও দেখবি। পদ্ম

পাতাগুলো বিক্রি করে যা পয়সা হবে তুই নিবি কিন্তু মাছ, তাল, সব্জি, চুরি গেলে তোকে গ্রামছাড়া করব।

কান্তির বৌ বাবার পায়ের কাছে বসে পড়ে বলল, দাদু চিন্তা নেই আমি সব খবর আপনাকে জানাব। ও ক্ষতি করলে আমি দায়ী।

মা বলল বেশ যা, তাই করবি। ন্যাড়াবৌদির কি হাসি। বাবার ভয়ে মুখ খুলতে না পেরে আমার কাছে এসে বলল, মেজবাবু কাল থেকে আমি চুরি করব—আমাকে কিছু বলবে না তো। বেড়ালকে মাছ পাহারা দিলে কি হয়। ফাঁক পেলেই · এইটুকু বলে ন্যাড়াবৌদি যে রকম ঘাড়টা নেড়েছিল—সেই ভঙ্গিমা আজও আমার অন্তরে গেঁথে আছে।

* * * *

পরের দিন থাকবে না সনৎ। কোলকাতা যাবে বিশেষ প্রয়োজনে। জানিয়ে গেল।

পরের দিন আবাব মজলিস বসল। যথারীতি, যথাসময়ে, যথাস্থানে।

সেদিনের কাহিনী হল—মাঠের ঐ বড় পুকুরের সঙ্গে দীর্ঘ এক মাইল ব্যাপী একটা বড় নালা ছিল সে নালার যোগ দিল ব্রাহ্মণী নদী পর্যন্ত। বর্ষাকালে মাঠ জলে ভেসে গেলে মাঠের জল ঐ পুকুরে নামত। পুকুরের মাছ ভেসে যাওয়ার ভয়ে নালার মাধ্যমে জল নিকেশ করে নদীতে ফেলা হত। আজও হয়। সে পুকুরও আছে --আছে সে নালাও। বংশধররা ভোগ করছে।

নালায় জল ছাড়া হলে, প্রচুর মাছ বেরিয়ে যেত। বাঁশ থেকে ছ্যাচা তৈরি করে নালার মুখে বাঁধ দেওয়া হয়—দুই পাশে শক্ত খুঁটি পুঁতে ঐ ছ্যাচাবেড়াটাকে বেঁধে রাখা হয়, যাতে করে জলের চাপে ভেঙে না পড়ে। বেড়ার ফাঁক দিয়ে জলগুলো নালা বেয়ে নদীতে পড়ে, কিন্তু মাছগুলো বেড়ার গায়ে ধাক্কা খেয়ে বেড়ার কিনারা ধরে চলার সময় সংলগ্ন একটা গভীর খাদে পড়ে যায়। সেখান থেকে উঠে পালাবার সুযোগ নেই। চিংড়ি, পুঁটি, খলসে ট্যাংরা, মাগুর, কই, চিতল, বোয়াল রুই, কাতলা সব মাছই নালা দিয়ে দৌড় মেরে বের হবার চেষ্টা করে

কিন্তু ঐ গর্তে পড়ে যায়। আমাদের কৃষাণরা গর্ত থেকে বালতির সাহায্যে মাছ তুলে ঝুড়িতে ঢালে—ঝুড়ির ফাঁক দিয়ে জল গলে যায়, সতেজ মাছগুলো লাফাতে থাকে। বড় সাইজের রুই, কাতলা গর্ত থেকেই তোলা হয়। বাকি পাবদা, পুঁটি, মাগুর, কই, সিঙি, ট্যাংরা, বেলে, বোয়াল, বাচ্ছা ষোল, বাণ এগুলোকে ছেঁকে তোলা হয়। দিনের মধ্যে চার পাঁচবারে ছেঁকে তুললে ১৫ / ২০ কেজি কি ৩০ কেজি মাছও দৈনিক ওঠে। মাছগুলো কৃষাণরা এনে খামার বাড়িতে ফেললে মা গরিব মধ্যবিত্ত প্রতিবেশীদের বিলি করে দিত। তখন রুই মাছের চার আনা সের। এখনকার এক কেজির থেকে পঞ্চাশ গ্রাম কম। ভেসে আসা মাছ বিক্রি কবলে আমাদের সম্মান থাকবে না, তাই বিলি করা হত। পুকুরে পর্যাপ্ত মাছ থাকত তার ওপর অধিক বর্ষায় ভেসে আসত। পুকুরের সংখ্যাও ছিল অনেক। মাঠের পুকুর ছাড়া অন্য সব পুকুরের জল বের হয়ে চলে যেত না।

একদিন ঐ নালার গর্ত যাকে বলা হয় 'আপা গাড়ি' ওখানে রাত্রি ২টার সময় দুই মাছ চোরকে ধরে আমাদের দু-তিন জন কৃষাণ। অন্ধকারে বাঁশের লাঠি মেরে তাদের মাথা ফাটিয়ে দেয়। তাদের ধরে নিয়ে এসে ডাকাডাকি করতেই আমরা ওদের গলা বুঝে বাইরে গোলাবাড়ির ধারে দুই রক্তাক্ত চোরকে দেখতে পাই। মাথা থেকে রক্ত বুক দিয়ে পা পর্যন্ত নেমে আসছে। ওদের রক্ত দেখে মা-তো ফিট হবার উপক্রম। কমলদাদুকে (ডাক্তার) তৎক্ষণাৎ ডেকে পাঠানো হয় কিন্তু সবচেয়ে বিখ্যাত সার্জেন ন্যাড়াবৌদি গাঁদাফুলের পাতা ও দুর্বাঘাস বেঁটে ক্ষতস্থান বেঁধে দেয়। রক্ত পড়া বন্ধ হয়। মা চাকরদের হুকুম করে ওদের রক্ত মাথা শরীর ধুইয়ে মুছিয়ে দিয়ে পরিষ্কার করতে। কমলদাদু আসার সঙ্গে সঙ্গে বাবা বলে ওঠে ওদের কি হাসপাতালে পাঠাব ? কমলদাদু পরীক্ষা করে দেখে বললেন না, প্রয়োজন নেই। মাথার হাড় ভাঙেনি, চামড়া কেটেছে। সঙ্গে সঙ্গে দুর্বাঘাসের সংযোগ মোক্ষম দাওয়াই। এরপর ওদের ছেড়ে দেওয়া হয় নি চিকিৎসা চলতে থাকে—খেতে দেওয়া সব কিছু।

ওরা খুব অভাবী লোক নয়। খুব গরিব ওদের বলা চলে না, স্বভাব চোর। ওদের ছেলেদের বয়সই ২০/২২ বছর। তারা এসে কাকুতি মিনতি করায় আর থানায় পাঠানো হয় নি। মা বলল, ডাক্তার যদি বলে সুস্থ, তাহলে ওদের ছেড়ে দাও। সুস্থ করে পরের দিন ছাড়া হল।

তাই ভাবি বিপদের সময় ন্যাড়াবৌদির তাৎক্ষণিক শুশ্রূষা স্মরণে রাখার মতো।

চতুর্থদিনের আলোচনা সভায় আরও প্রতিবেশী ও পরিচিত লোক-দের সমাগম হল। আমি ধীরে ধীরে স্মৃতি রোমন্থন করে আরও কয়েকটি চমকপ্রদ ঘটনার উল্লেখ করলাম। সকলেই আগ্রহ সহকারে শুনতে লাগল।

সে সময় প্রতি বৎসর দুবার করে 'কাঙালী বিদায়' করা হত। 'কাঙালী বিদায়' কথাটার অর্থ—যারা অত্যন্ত গরিব, হাড়ভাঙা খাটুনি খেটেও দুবেলা পেট পুরে খেতে পেত না এবং যাদের বাসস্থান ছিল ঝুপড়ির মত. সেই মাপের দু-তিন হাজার লোককে মুড়ি মুড়কি ও আখের গুড় দেওয়া হত—পৌটলা ভর্তি করে, আর দুটো করে পয়সা যা খাঁটি তামার তৈরি। ওজনে আজকালকার একটাকা কয়েনের মত। তখনকার সেই খাঁটি তামার দু' পয়সা (কেউ কেউ বলত ডবল পয়সা) এখন তার মূল্য এখনকার দু টাকার মতই। নির্দিষ্ট দিনের আগের দিন গ্রামে ঢোল পিটিয়ে জানিয়ে দেওয়া হত কাঙালী বিদায়ের খবর। এর জন্য কযেক লরি মুড়ি ও মুড়কির বস্তা, ঐ ধরনের দু পয়সার পোঁটলা, কয়েক টিন গুড় এবং টিন ভর্তি সরষের তেল মজুদ রাখা হত। নির্দিষ্ট দিনে খামাব বাড়ির এক গেট দিয়ে সকাল সাতটা থেকে কাঙালী-দের ঢুকতে দিয়ে লাইন করা হত—বেলা ১টা পর্যন্ত বা তার কিছু বেশি সময় পর্যন্ত অপব গেট দিয়ে ঐ সমস্ত জিনিস নিয়ে তাদের বিদেয় হতে হত। ভোট দেওয়ার সময় যেমন আঙুলের নখে কালির ফোঁটা দেওয়া হয় যাতে কেউ দুবার ভোট দিতে না পারে সেই মত কাঙালী বিদায়ের সময় মাথার সিঁথিতে ১ পলা তেল ঢেলে দেওয়া হত

গেট পার হওয়ার সময়। সিঁথির চুলে জবজবে তেল দেখলেই ধরা পড়ে যেত কেউ যদি দ্বিতীয়বার লাইনে দাঁড়াতো। লাইন দুটো হতো। একটা পুরুষদের, অপরটা মহিলাদের। মহিলাদের লাইনের গেটের পাশে দাঁড়িয়ে থেকে মেয়েদের সিঁথিতে তেল ঢালার দায়িত্ব ছিল ন্যাড়াবৌদির। পুরুষদের দিত কৃষাণরা।

স্বর্গীয় পূর্ব-পুরুষদের আত্মার শান্তি কামনায় এই ভাবে গরিবদের বিতরণ করা হতো। অনেক ধনীব্যক্তিই 'কাঙালী বিদায়' করতেন। এখনকার দিনে ওসব কল্পনাতীত।

কাঙালী বিদায়ের দিন ন্যাড়াবৌদির কর্ম তৎপরতার চিত্র আজও আমার স্মৃতিপটে ভেসে ওঠে। সেই স্মৃতি রোমন্থন করে আজ ন্যাড়া বৌদির অভাবে নিজেকে বড়ই অসহায় বোধ করছি।

এরপর নবান্ন উৎসবের কথাটা মনে করিয়ে দিল পাঁচি। সঙ্গে সঙ্গে আমি নবান্ন উৎসবের কথাও বলতে লাগলাম। ঐ উৎসবের কথা সকলেই জানে—কারণ আজও ঐ এলাকায় মহা ধূমধামের সঙ্গে নবান্ন উৎসব পালিত হয়, প্রতিটি ঘরে ঘরে। তবে সে সময়ের চিত্র ছিল অন্যরূপ।

এখনকার দিনে বছরে অন্তত তিন বার পাকা ধান কাটা হয়। তখনকার দিনে আমন বা আউস ধান বছরে একবারই ফলত। সুতরাং পাকা ধান মাঠ থেকে কেটে এনে খামারে গাদা দেওয়ার পর ঝেড়ে নিয়ে সেগুলোকে গোলাজাত করা হোত। গরুর গাড়ি করে মাঠ থেকে পাকা ধান কেটে বোঝাই করে আনা হত। এখন লরির সাহায্যেও আসে। শেষ গাড়ি ধান আনার সময় এক আঁটি স্পেশাল ধান এনে খামার বাড়ির কোন গাছের মাথায় তাকে বেঁধে দেওয়া হতো পাখিদের খাবার জন্যে। তাকে বলা হত 'দাওন'।

নতুন ধানের চাল করে গৃহস্থরা খাওয়ার পূর্বে প্রথমে গরিবদের খাইয়ে দেবার রীতি ছিল, আজও আছে। তবে সে ধরনের মানসিকতা নেই। নতুন ধানের আতপ চাল গুঁড়ো করে ভিজিয়ে রেখে—দুধ, গুড় পাকাকলা, আখের কুচি, কিচমিচ, কর্পূর আরও অনেক কিছু সংযোগে একটা উপাদেয় খাদ্য প্রস্তুত করা হোত, আজও হয় এবং গরিবদের সার-

বন্দি বসিয়ে কলার পাতায় পরিবেশন করা হতো। আজও হয়ত হয় কিন্তু মাত্র জন কয়েক যারা জমিতে খাটে তাদের পরিবার গুলোকে। তারপর পুকুরের চারা পোনা তুলে, নতুন আলু, কপি, ডাল ইত্যাদি রান্না-বান্না করে গরিবদের খাইয়ে দেওয়ার রেওয়াজ ছিল। একে বলত 'নবান্ন উৎসব'। এখনও হয় কিন্তু নিজেদের পরিবার বর্গের মধ্যে তা সীমিত, সে সময়ে স্যাড়াবৌদি প্রতিবেশী গরিব মেয়েদের নিয়ে ভোর রাত্রি থেকেই বিরাট আয়োজন করত, কৃষাণরাও সমানে পরিশ্রম করত। পদ্মপাতা, কলাপাতা অথবা শালপাতা ও মাটির গেলাসে জল দিয়ে গরিবদের সারিবদ্ধ ভাবে বসিয়ে ভোজন করানো হত। তার মধ্যে যে আন্তরিকতা ছিল আজকের দিনে তার অভাব।

এবপর বক্তার পবিবর্তে আমাকে শ্রোতা হতে হল। পাঁচি অনেক কাহিনী শোনালো। সেদিনের মত অধিবেশন সমাপ্ত।

পরের দিনের অধিবেশনে আমার একছেলে কৌতূহল বশত জানতে চাইল—দাদুর ঘোড়ার নাম ছিল বাহাদুর। ঐ বাহাদুরের পিঠে চড়ে দূরের গ্রামে যাবার সময় তাঁকে বাঘে আটকেছিল তোমার মুখে শুনেছি, বেশ ভাল লেগেছিল—সবটা মনে আসছে না একবার বল না?

দেখলাম—পাঁচির পরিবারবর্গ, আমার পরিবারবর্গ এবং দাদার পরিবারের উপস্থিত সকলে এমন কি সনৎ ডাক্তারও খুবই উৎকর্ণ, এ বর্ণনা শোনার জন্য।

"তখন আমি ছোট। পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ি। আমার জন্যে তখন আলাদা ঘোড়া কেনার প্রশ্নই ছিল না। ছিল বাবার ঘোড়া বাহাদুর। পাল্কি চেপে মা যাচ্ছে বাপের বাড়ি। সঙ্গে দশ জন বাহক তাদের বলতো বেয়ারার। আমি মার সহযাত্রী। দাদার পরীক্ষা ছিল বলে তাকে যেতে দেওয়া হয় নি। দাদুর বাড়ি পৌছনোর চার / পাঁচদিন পরই আমি ভীষণভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ি। সে খবর পাওয়ার পর বাহাদুরের পিঠে চড়ে বাবা আমাকে দেখতে যাচ্ছে। কয়েক মাইল যাওয়ার পরই ঘূর্ণিঝড়ের দাপটে বাবাকে সিঙ্গি গ্রামে যেখানে বাংলা মহাভারতের লেখক কাশীরাম দাসের জন্মস্থান, সেখানে কোন এক ভদ্রলোকের

বাড়িতে আশ্রয় নিতে হয়। ঝড়-বৃষ্টি না-থামা পর্যন্ত তাঁরা বাবাকে ছাড়েন নি। অনেক সময় নষ্ট হয়। সিঙ্গি গ্রাম থেকে ওকোরসা গোবডাঙ্গা, নাকাদা গ্রাম পার হয়ে বেলেরহাট গ্রাম পৌঁছনোর সঙ্গে সঙ্গে সন্ধ্যা নেমে আসে। সামনে নিমদহ গ্রাম পার হয়ে কালেখাঁতলা (দাদুর বাড়ি) যাওয়ার পথে একটা ঘন জঙ্গল পার হতে হয়। তার নাম বেলেটোনার মাঠ, এখনও আছে তবে জঙ্গল নেই। পাকা রাস্তাও হয়েছে। বাস চলাচল করছে, জঙ্গলের সরু রাস্তা ভেদ করে যাওয়ার সময়ই অতর্কিতে একটা বাঘ লাফ দিয়ে এসে রাস্তার মোড়ে বসে লেজের ঝাপটা মারতে থাকে। আর ঘন ঘন হুঙ্কার। কোন পথিক বাঘের কবলে পড়েছে বুঝতে পেরে স্থানীয় বাসিন্দারা, তাদের 'বুনো' নামে তখন ডাকা হত, গোছা গোছা পাটকাঠিতে আগুন ধরিয়ে টিন বাজাতে বাজাতে বাবাকে উদ্ধার করতে আসে। বাবার ভয় বাঘের হুঙ্কারে ঘোড়া ভয় পেয়ে যদি পিঠ ঝাড়া দিয়ে বাবাকে ফেলে দেয় এবং পালিয়ে যায় তা হলে বাঘ ঘোড়াকে তাড়িয়ে ধরে হত্যা করবে—অবশ্য-ম্ভাবী। ঘোড়ার লাগাম শক্ত হাতে ধরে জিনের রেকাবে দুই পা ঢুকিয়ে তল পেট দিয়ে পায়ের ছাদ দিয়ে ঘোড়াকে শক্ত করে ধরে রাখে। ইতি-মধ্যে আগুন জ্বেলে ঐ লোকগুলো টিন বাজাতে বাজাতে হাজির হতেই ভয় পেয়ে বাঘটা এক লাফ দিয়ে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়ে। লোক-গুলো পাটকাঠির আগুনে বাবাকে চিনতে পারে। ওদের সর্দার রঞ্জন এসে বাবাকে দেখে অবাক হয়ে যায়। 'দোঘরী' নামে যে গ্রামটা আজও আছে ঐ গ্রামটার প্রচুর জমির মালিক ছিলাম আমরা। রঞ্জন ছিল ঐ জমিগুলোর ফসল তৈরির কেয়ার টেকার, আমাদের বড় বড় আম বাগান, কাঁঠাল বাগান, কলা বাগান ও লিচু বাগান ছিল ঐ দোঘরী গ্রামে। গরু অথবা মোষের গাড়ি করে ঐ সব ফল আমাদের বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া হত। গ্রামের বাজারে গাড়ি থামিয়ে কৃষাণরা লোক বুঝে ফল বিলি করত। বাড়ির জন্যেও প্রচুর থাকত—তাতে আমাদের খুব সুনাম হত।

বাবাকে ঘোড়া থেকে ধরাধরি করে নামিয়ে রঞ্জন ঘোড়ার লাগাম

শক্ত করে ধরে তাদের বস্তিতে নিয়ে গিয়ে বাবাকে ও ঘোড়াটাকে জল খাওয়ায় তারপর পনেরো বিশজন লোক সড়কি বল্লম পাটকাঠির বোঝাতে আগুন জ্বেলে টিন বাজিয়ে বাবাকে পৌঁছে দিল দাতুর বাড়িতে। দাতু তাঁর জামাই (আমার বাবাকে) বকেছিলেন ঐ রকমের ঝুঁকি নিয়ে রাতে জঙ্গল ভেঙে আসার জন্য। মাকে চোখ মুছতে দেখেছিলাম, আমাকে বাবা কোলে তুলে নিয়েছিল, আজও মনে পড়ে।

আমাকে সুস্থ দেখে পরের দিনই বাবা বাহাতুরকে নিয়ে চলে আসে। আমরা আরও পনের দিন ছিলাম।

বিরাট ধনীলোকের মেয়ে হওয়া সত্ত্বেও মা গরিবদের অন্তরে টেনে নিত কি করে সে প্রমাণ পেলাম সেবারে দাতুর বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে।

মায়ের জন্মের পর যে পবিচারিকা মায়ের পরিচর্যা করত তাকে 'ধাইমা' বলত মা। দশ মিনিটের পথ তার বাড়ি। দাতুর পয়সায় দাতুর জমিতেই তার বাড়ি বাগান পুকুর ইত্যাদি হয়েছে। বাবা চলে আসার সপ্তাহ খানেক পরে সেই বৃদ্ধা ধাইমা এল মাকে ও আমাকে তার বাড়িতে নিয়ে যেতে। মা ও আমি হাঁটতে হাঁটতেই গেলাম। তার বাড়ি মাটির তৈরি, টিনের ছাউনি। পুকুরে অনেক রাজহাঁস। বড় বড় পাঁঠা ও খাসী এবং গাই-গরু সারি সারি বাঁধা। পুকুরের পাড়ে আম লিচু কলা গাছের বাগান, ভাল পরিবেশ! মা সবই ঘুরে ঘুরে দেখল আমিও মার হাত ধরে ঘুরলাম। ভালই লাগল।

হরিণের চামড়ার আসনে আমাদের বসতে দিয়েছিল। আমাদের নিয়ে যাবে বলে মার 'ধাইমা' (আমাকে মা 'নান্নী' বলে ডাকতে শিখিয়েছিল) দই পেতে রেখেছিল। বড় কানা-উঁচু কাঁসার থালায় ভিজে চিড়ে মর্তমান কলা, দই, পাকা আম ও খেজুরের গুড় দিয়েছিল। পাড়ার বউ-ঝিরা দলে দলে মাকে দেখতে এসেছিল। উঁচু দাওয়ায় বসে আমরা ফলাহার করলাম খুব তৃপ্তির সঙ্গে। মা ওদের বাচ্চা-কাচ্চাদের হাতে দেবার জন্যে অনেক খুচরো টাকা দিয়েছিল। নান্নী আবার রেখে গিয়েছিল। সঙ্গে করে অনেক পাকা পেয়ারা আম এনেছিল। ঐ

দিনের বেড়ানোর কথা মনে পড়লে খুব আনন্দ পাই। বড় হয়ে অনুভব করলাম এই ভাবেই মা গরিবদের ভাল বাসতে শিখেছে।

পরের দিনের অধিবেশনে স্ত্রী জিজ্ঞেস করল, তোমার মুখেই শুনেছি তোমার ঘোড়াটাকে কে নাকি মেরে ফেলেছিল। পাঁচি বাধা দিয়ে বলল সে ঘটনা বলতে হবে না। আমাব চোখের সামনে ঘটেছে।

পাঁচিকে আশ্বাস দিয়ে বললাম, তোর ভয় নেই, বহুদিন হয়ে গেল এখন নিজেকে সামলাতে পেরেছি। চৈতকের কথা উঠলে মন খারাপ হয় ঠিকই কিন্তু আর তত বিচলিত হই না। কোলকাতায় কাজে ডুবে থাকি—মজলিশ করার সুযোগ থাকে না, এদের সামনে বলে এখন দুঃখের কাহিনী হলেও মনটাকে হাংকা করতে পারব। যারা শুনবে তাদের দুঃখ হবে, এখন বললেও আমার আব দুঃখ হবে না, মন বুঝে গেছে। পাঁচি চুপ করে রইল।

সেদিনের অধিবেশনে স্বপন, তপন নাতবৌরা ওদের বাচ্চা-কাচ্চা আমার স্ত্রী, ছেলেরা, পাঁচি এবং দাদার ছেলে মেয়ে নাতি নাতনীরাও উপস্থিত ছিল। আমি বলে আনন্দ পাচ্ছি, ওরা শুনে চোখেব জল ফেলছে এই যা তফাৎ।

আমি বলতে আরম্ভ করলাম—আমাদের যেমন ঘোড়া ছিল তেমনি ছিল ওপাড়াব কমলদাদুর। দাদু ছিলেন নাম কবা ডাক্তার, পাড়াগাঁ—কাদার জন্যে ঘোড়ায় চড়ে রোগী দেখতে যাওয়ার রেওয়াজ ছিল। আমাদের ছিল পুরুষ ঘোড়া—দাদুর মেয়ে ঘোড়া।

আমি তখন ম্যাট্রিক পড়ি। দশম শ্রেণীর ছাত্র। স্কুল থেকে ফেরার পর আমার ঘোডা চৈতককে 'ফ্যালা' মাঠের বড় পুকুরের পাড়ে নিয়ে গিয়ে বড় বড় ঘাস কেটে খাওয়াতো। আমি তখন ফুটবল খেলতে মাঠে যেতাম।

পাশের গ্রামের নাম নন্দীগ্রাম। দাদু রোগী দেখে ফিরছেন দূরের মাঠ দিয়ে। ফ্যালা একমনে ঘাস কাটছে। চৈতক ঘাড় তুলে দূরের মাঠ দিয়ে সেই মেয়ে ঘোড়াকে যেতে দেখে ছুট দিয়েছে, ফ্যালা টের পায়নি। একটু পরে উঠে দেখে চৈতক নেই—দূরের মাঠে দুটো ঘোড়া

মারামারি করছে। দাদু ঘোড়া থেকে লাফ দিয়ে পড়ে প্রাণ বাঁচিয়েছেন। ঘোড়া দুটো মারামারি করতে করতে দাদুর বাড়িতে পৌঁছেছে। দাদুর ঘোড়া দেখাশুনা করত মধু নামে এক ছোকরা। দাদুকে ঘোড়ার পিঠে দেখতে না পেয়ে সে তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠে এবং হাতের হাঁসুয়া ছুড়ে চৈতককে মারে। ওদের মেয়ে-ঘোড়াকে চৈতকের হাত থেকে বাঁচাতেই কিংবা দাদুকে কোথায় ফেলে দিয়েছে সেই রাগে সে হাঁসুয়া ছুড়ে দেয়। হাঁসুয়া লাগে চৈতকের তলপেটে। ঘোড়ার তলপেটের চামড়া নরম হয়। হাঁসুয়ার চোট লাগার সঙ্গে সঙ্গে মনে হয় চৈতক এক লাফ দেয়, ফলে তার নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে যায়। প্রচুর রক্ত ও নাড়িভুঁড়ি দেখে এবং চৈতককে গড়াগড়ি ও যন্ত্রণায় ছটফট করতে দেখে মধু সন্ধ্যার অন্ধকারে গা-ঢাকা দেয়। পরে জানা গেল সে কোনদিন আর এ গ্রামে ফিরে আসেনি। তার বাড়ি ছিল ২৪ পরগনা জেলায়।

কিছুক্ষণের মধ্যে ফ্যালা সেখানে পৌঁছে চৈতকের অবস্থা দেখে চিৎকার করে ওঠে। পাশের বাড়ির লোকেরা হ্যারিকেন নিয়ে ছুটে আসে। ফ্যালা মূর্ছা যায়-যায়। লোকেরা তাকে ধরে বসিয়ে জল খাওয়ায়। সে চিৎকার করে কাঁদতে থাকে। ইতিমধ্যে দাদু বাড়ি পৌঁছে চৈতকের অবস্থা দেখে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েন। তিনি তৎক্ষণাৎ আমাদের বাড়িতে খবর পাঠান। আমার দাদা তার আগেরদিন দিনাজপুর থেকে বাড়ি এসেছে। দাদা সেখানেই থাকত। খবর পেয়েই দাদার সঙ্গে সঙ্গে পাড়ার লোকেরা ছুটে গিয়ে যা দেখে তা অবর্ণনীয়। দাদু এবং দাদুর বাড়ির লোকেরা মধুকে খুবই গালাগাল করছিলেন। আমি খেলার মাঠ থেকে বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক করতে করতে গ্রামের দিকে ফিরছি। হঠাৎ দুটো ছেলে দৌড়ে এসে আমাকে খবর দেয়। আমি দৌড়ে দাদুদের বাড়ির দিকে যাচ্ছি, এমন সময় আমাদের নায়েববাবু ও চার-পাঁচজন লোক আমাকে মাঝ রাস্তায় আটকে আমাদের বাড়ির দিকে জোর করে নিয়ে যায়। পরে শুনলাম দাদা চৈতকের আর্তনাদ দেখে তৎক্ষণাৎ আমাদের বাড়ি থেকে বন্দুক আনার জন্য ছুটে আসে। দাদা বলতে থাকে চৈতককে শাস্তি দিতে

চাই। গ্রামে পশুচিকিৎসক নেই। নাড়িভুঁড়ি সমস্ত বেরিয়ে গেছে, এমন অবস্থায় তাকে বাঁচানোর কোন উপায় নেই, সুতরাং গুলি করে মেরে ফেলাই ভাল। তাহলে দীর্ঘস্থায়ী যন্ত্রণা হতে সে রেহাই পাবে। কিন্তু ন্যাড়াবৌদি তার হাত থেকে বন্দুক কেড়ে নিয়ে ঘরে তালা বন্ধ করে দিয়েছে। তার বক্তব্য তুমি চৈতককে গুলি করতে যাচ্ছ। মেজবাবু ঐ বন্দুক কেড়ে নিয়ে মধুকে গুলি করবেই করবে, কারণ চৈতক তার প্রিয় বাহক। সে কারো কথা শুনবে না, তখন হিতে বিপরীত হবে। সে কথা ভেবেই মা নায়েববাবুকে নির্দেশ দেয়, দু-চারজন লোক সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে মাঠ থেকে সরাসরি যেন আমাকে বাড়িতে নিয়ে আসে। ন্যাড়াবৌদির কথায় দাদা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে আবার দৌড়ে যায় চৈতকের কাছে। বাবাকে লোকেরা আটকে দেয়। বাবা বৈঠকখানায় বসে চোখের জল মুছতে থাকে, মার অবস্থা আরও ভয়াবহ। যেন পুত্র শোকে হা-হুতাশা। কয়েকজন মহিলা মাকে ঘিরে সান্ত্বনা দিচ্ছে। কিন্তু তাও কি সম্ভব? প্রতিদিন দুপুরে চৈতক বাড়ি আসত। ভিজে ছোলা, ভাত সহ ভাতের ফেন, আনাজপাতির খোসা তার জন্য নির্দিষ্ট থাকত। সে কোন সময় আসবে সকলেরই জানা ছিল। তার জন্য নির্দিষ্ট পাত্রে রাখা খাওয়া-দাওয়া সেরে উঁচু দাওয়ায় বসে-থাকা মার পায়ের কাছে একবার শুঁকে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত। মা কপালে হাত দিয়ে আদর করার পর সে আস্তে আস্তে খামারের দিকে চলে যেত—নিজস্ব আস্তাবলে।

চৈতক মারা যায় রাত্রি ৮-৩০ মিনিটে। বাড়ির কেউ সে রাত্রে খাওয়া-দাওয়া করেনি। বৌদিরা অঘোরে চোখের জল ফেলেছিল। চাকর-চাকরানীরাও সমানে অশ্রুপাত করেছে। সারারাত্রি হ্যাচাগ জ্বেলে রেখে লোকজন চৈতকের মৃতদেহ পাহারা দেয়—কারণ শেয়াল এসে মাংস ছিঁড়ে খাবে। আমাকে একটা ঘরে প্রায় অন্তরীণ রাখা হয়। পাহারায় থাকে দু-তিনজন। কখন দরজা খুলে চৈতকের কাছে দৌড়ে যাই এবং অঘটন ঘটাই, এটাই ভয়। অভুক্ত অবস্থায় বুকফাটা আর্তনাদ করে কাঁদতে কাঁদতে ভোরের দিকে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে

পড়ি। সকালে উঠে দেখি লোকে-লোকারণ্য। ঠাকুর বাড়ির পাশের চত্বরে অনেকখানি গর্ত করা হয়েছে। নতুন বস্ত্র এনে চৈতককে মুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। ন্যাড়াবৌদির কান্নাকাটিতে আমাকে ঘুম থেকে উঠিয়ে এনে একবার চৈতকের মুখটা দেখানো হয়। আমি সংজ্ঞা হারাই। আমাকে প্রকৃতিস্থ করারপর তবে তাকে গোর দেওয়া হয়। শত শত মহিলার শেষ প্রণাম গ্রহণ করার পর চৈতক শেষশয্যা গ্রহণ করে। গোর দেওয়া সমাপ্ত হলেও চৈতকের মাথার কাছ থেকে আমাকে কেউ উঠিয়ে নিয়ে যেতে পারেনি। প্রায় ঘণ্টা দুয়েক পর মা এসে কাঁদতে কাঁদতে আমার হাত ধরে আমাকে উঠিয়ে নিয়ে যায়। বাবা-মাকে দেখে যে কোন লোক বুঝতে পারে এরা পুত্রশোকে জর্জ্জরিত।

দুদিন পর রাজমিস্ত্রি ডেকে তার কবরের পাশে সিমেণ্টের ফলক তৈরি করানো হয়। দাদা আমাকে বলে, তুই সিমেণ্টের ওপর স্পষ্ট করে লিখে দে, 'চৈতক তোকে আমরা ভুলব না। তুই রইলি আমাদের অন্তরে গাঁথা।' আমি চোখের জলে বুক ভাসিয়ে দাদার কথা মত ঐ কথা কটি লিখে দিলাম। বাবা-মা, দাদা ও নায়েব-গোমস্তা চাকর বাকর সকলে চৈতকের কবরটিকে পরিক্রম করে ঈশ্বরের কাছে তার শান্তির জন্য প্রার্থনা জানায়। সে এক অভিনব দৃশ্য।

দীর্ঘদিন পর আমার কাছে বসে একথাগুলো যারা শুনছিল সকলেই নিশ্চুপ। হঠাৎ নীরবতা ভঙ্গ করে পাঁচি বলে উঠল, বাবা উঠে চলুন খাবার সময় হয়েছে। একে একে সকলে নীরবে উঠে গেলাম।

পরের দিনের অধিবেশন বসল সন্ধ্যার পরই।

আরও সমাগম।

ইংরাজী ১৯৫০ সাল। কোলকাতা আসছি কাটোয়া লোকাল ধরে। কাটোয়ার পরের স্টেশনই দাঁইহাট। আমাদের হোম স্টেশন। সকাল সাড়ে ১০ টায় চেপেছি। ৪৫ মিনিট আসার পর নবদ্বীপ পৌঁছলাম। সেখানে এসেই জানতে পারলাম হিন্দু-মুসলমানে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা শুরু হয়েছে। ভীষণ চিন্তায় পড়লাম। জনশ্রুতি শুনে বুকের মধ্যে হাপরের টান আরম্ভ হল। সেদিনই দাদা-বৌদি দাঁইহাট স্টেশন থেকে শান্তিনিকেতনের পথে রওনা হয়েছে। আমার সহযাত্রী স্বগ্রামবাসী পরমহিতৈষী, আমাদের পরিবারের একান্ত শুভাকাঙ্ক্ষী অনিলদা (অনিল বড়াল) ও তার এক আত্মীয়া। মহিলার কোলে মাস ছয়েকের শিশু। আমার পরিচিতের মধ্যে সে কামরায় তখনকার মত কেউ ছিল না। আমি তখন সেন্ট্রাল ক্যালকাটা কলেজের ছাত্র। পাড়াগাঁ থেকে তখন স্টেশনে আসার ব্যবস্থা ছিল গরু অথবা মোষের গাড়ি। গাড়ির ওপর বিচালি বা খড়, তার ওপর শতরঞ্জি পেতে পাশে বালিশ দিয়ে বসে আরামে আসতে হত। গাড়ির ছাউনিকে বলতো ছই বা টপ্পর। রাস্তায় হতো প্রচণ্ড কাদা। তখনও পাকা রাস্তা হয়নি অথবা বাস রিক্শ চলাচলের ব্যবস্থা ছিল না। আমার ঘোড়ায় চড়ে আসার ব্যবস্থা পাকা। আমার সহিস ফ্যালার আগে-ভাগে স্টেশনে এসে বসে থাকার কথা। আমি ট্রেনে উঠলে সে ঘোড়া নিয়ে বাড়ি ফিরবে, এটাই ঠিক ছিল। কিন্তু অনিলদা আমার বাবা-মাকে প্রণাম করতে গিয়ে মাকে বলল, 'মামীমা, ইসমাইল আমার গাড়িতেই যাবে, অহেতুক ফ্যালাকে পাঠানোর দরকার নেই—চৈতককে (ঘোড়ার নাম) যেতে হবে না। মা খুব খুশি হল—বাবাও তাই, ওরা যুগপৎ অনিলদা

ও আমাকে মাথায় হাত ঠেকিয়ে আশীর্বাদ করল। আমরা বিদায় নিলাম।

নবদ্বীপ এসে শুনলাম তখনকার পূর্ব পাকিস্তানে হিন্দুদের ওপর প্রচণ্ড অত্যাচার করেছে সেখানকার মুসলমানরা। তারা দলে দলে দেশ ছেড়ে এদেশে চ'লে আসছে। বদলা স্বরূপ এক শ্রেণীর উন্মত্ত জনতা নিরীহ, নিরপরাধ মুসলমানদের হত্যা ও পূর্ব পাকিস্তানে বিতাড়নের জন্য আদাজল খেয়ে লেগেছে। তখন কংগ্রেসি শাসন। কেন্দ্রে প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহরু, পশ্চিমবঙ্গে মুখমন্ত্রী মাননীয় ডঃ বিধান চন্দ্র রায়।

নবদ্বীপ থেকে ট্রেন ছাড়ল অনেকটা দেরি করেই। সমুদ্রগড় পার হল নির্বিঘ্নেই। ধাত্রীগ্রাম, বাঘনাপাড়া, গুপ্তিপাড়া—তিন স্টেশনেই প্রবল উত্তেজনা। একদল উন্মত্ত জনতা কামরায় কামরায় মুসলমান খুঁজে বেড়াচ্ছে। কালনা পৌঁহনোর আগে—উন্মত্ত জনতা একজন মুসলমান হকারকে ছুরি মেরে হত্যা করে। ট্রেন থেকে ছুড়ে নিচে ফেলে দেয়। ট্রেনের কামরায় রক্তের ছড়াছড়ি। তার লুঙ্গি, দাড়ি ইত্যাদি দেখে বোঝা যায় সে গ্রাম্য এক মুসলিম হকার। ট্রেনে সিদ্ধ ডিম বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করে। এ দৃশ্য দেখে উভয় সম্প্রদায়ের নারী পুরুষ আতঙ্কে জড়সড়।

আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ়। অনিলদা বিভ্রান্ত, যেন উন্মাদ। স্রেফ আমাকে বাঁচানোর তাগিদ আর মহিলাটির গহনা ও তার বাচ্চাটাকে রক্ষা করা।

তিলেকের মধ্যে অনিলদা ভদ্রমহিলাকে ইশারা করে আমার পাশে বসতে বলে। মহিলার কোলে শিশু, হাতে শাঁখা, সিঁথিতে সিঁদুর। আমি ধুতি পাঞ্জাবি পরিহিত ফিটফাট বাঙালি যুবক। মহিলা নির্বাক, আমারও কণ্ঠ রোধ। প্রবল জল পিপাসায় প্রাণ ওষ্ঠাগত। তৎপর অনিলদা স্টেটসম্যান কাগজ খানা বের করে, আমার হাতে দিয়ে, একমনে চুপিচুপি পড়ে যেতে বলে। আমি অনেক কিছুই পড়ে যাচ্ছি কিন্তু চোখে কিছুই দেখছি না। কাগজটায় কোন অক্ষরই ওঠেনি—অর্থাৎ আতঙ্কে আমি আমার চোখের দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছি। কালনা-

ত্রিবেণীর মধ্যে আবার হৈ চৈ। কয়েকজন মুসলমানকে মেরে ট্রেন থেকে ফেলে দেওয়া হয়েছে। কারও কিছু বলার নেই, করারও নেই কিছু। পুলিস টুলিসের কোন বালাই নেই। ট্রেন চলেছে তো চলেছেই। ব্যাণ্ডেলের কাছ বরাবর আর একটা ঘটনা ও হৈ চৈ-এর শব্দ শোনা গেল।

ব্যাণ্ডেলে পুলিস খুব তৎপর বলে মনে হল। ব্যাণ্ডেল থেকে ট্রেন একেবারে হাওড়া স্টেশন। স্টেশনেও বেছে বেছে মুসলমান হত্যা হচ্ছে। সে সঙ্গে হিন্দু মুসলমান দেখাদেখি নেই, মহিলাদের গহনাও লুট হচ্ছে নির্বিকারভাবে।

উদ্‌ভ্রান্ত অনিলদা ধৈর্য হারায়নি। সে সময় কুলি নিরাপদ নয় ভেবে মহিলার ও আমার ব্যাগ-ব্যাগেজ নিজের মাথায় তুলে মহিলার বাচ্চাটিকে আমার 'কোলে দিয়ে খুব নিচু স্বরে তাকে বলে দেয় তোর কাকার হাত ধরে ধরে আয়, ওকে অন্য কিছু বলিস না, বল্‌বি 'মুক্তি কাকা'। মহিলাটি ছোটবেলা থেকেই আমাকে কাকা বলেই ডাকত। সেদিনের সেই আতঙ্কগ্রস্ত পরিবেশে অনিলদার নির্দেশকে খেয়াল রেখে গোটা প্লাটফর্মটা 'মুক্তি কাকা, মুক্তি কাকা' বলে সম্বোধন করতে করতে প্লাটফর্ম পার হল। অনিলদার গলার স্বর দ্বিগুণ বেড়ে গেল। 'মুক্তিবাবু এদিকে এস, মুক্তিবাবু এই এদিকে।' আতঙ্কগ্রস্ত জনতাকে ঠেলতে ঠেলতে গুটি-গুটি পা-পা করে প্লাটফর্ম পার হলাম—ঘর্মাক্ত কলেবর, আতঙ্কগ্রস্ত মন, অবসন্নতায় পর্যুদস্ত। মহান সৃষ্টিকর্তাকে সহস্র সহস্র ধন্যবাদ—সে সময় মুক্তিবাবুর দিকে অনেকেরই নজর পড়েছিল অনিলদার চীৎকারের তাড়নায়, কিন্তু 'ইসমাইলের' দিকে কেউ ফিরেও চায়নি, 'ইসমাইল' তখন মুক্তিলাভ করে—'মুক্তিবাবু'-তে রূপান্তরিত।

স্টেশন ছেড়ে বাইরে আসি তখন ছিল। ঘোড়ার গাড়ির স্ট্যাণ্ড ও বড় ট্যাক্সির আড্ডাস্থল। ট্যাক্সিতে ছিল না কোন মিটার সিস্টেম। মিনিট্যাক্সি বা মিনি বাসের জন্ম হয়নি তখন।

স্টেশন থেকে বেরিয়ে প্রথম যা চোখে পড়ল তাতে আত্মারাম

খাঁচা ছাড়া হওয়ার উপক্রম। তিন-তিনটে ঘোড়ার গাড়ি পরপর লাইন দেওয়া, ঘোড়াগুলো ঝিমুচ্ছে—ঘোড়ার গাড়ির চালক অর্থাৎ কোচম্যানরা নেই—আছে মৃত্যুশয্যায় শায়িত। চাদর ঢাকা—ওরা ছিল মুসলমান। একেবারে শেষ। লোকমুখে শোনা গেল। তৎপর অনিলদা সেখান থেকে আমাদের ঠেলতে ঠেলতে মাথায় বোঝা নিয়ে গঙ্গার ধার বরাবর একটা বন্ধ দোকানের পাশে আমাদের দাঁড়াতে বলল, মাথার বোঝা নামিয়ে আমাদের দুজনকে পাশাপাশি বসিয়ে দিয়ে বলল, কারও দিকে তাকাবি না, চুপচাপ বাচ্চাটাকে দুজনেই আদর কর। আমি একজন শিখ ড্রাইভার দেখে ট্যাক্সি নিয়ে আসছি। আমরা তাই করলাম। অনিলদা যাওয়ার মিনিট খানেক পরেই সাইকেল আরোহী তিন যুবক, সাইকেল থেকে নেমে, প্রশ্ন করল দাদা কোথায় যাবেন। প্রথমটায় কথা বলতে পারছিলাম না—কিন্তু কথা না বললে সন্দেহ হতে পারে ভেবে গলাটা ঝেড়ে নিয়ে বললাম—বালিগঞ্জ। খুব জোর গলাতেই বলতে হল—নতুবা সন্দেহ জাগতে পারে। ওদের নজর আমার দিকে ছিল না। ছিল মহিলার গহনার দিকে। পরিষ্কার বোঝা গেল ওরা লুটেরা, হাঙ্গামার সুযোগে ওদের পক্ষে লুট করা সুবিধে। আমাকে বলল, আমরা হেল্প করতে পারি? দরকার নেই—জোর গলায় বললাম। বেশ শক্তভাবে তীব্র দৃষ্টিতে চাইলাম—ওরা ইতস্ততঃ করতে লাগল। ঠিক সেই সময় একজন শিখ ড্রাইভারসহ ট্যাক্সি নিয়ে অনিলদা হাজির, সাইকেল-আরোহীরা সরে পড়ল।

আমি অনিলদাকে বললাম 'ওদের বালিগঞ্জ যাব বলেছি,' অনিলদা বলল, তাই বলতে হবে: তুই ঠিক বলেছিস। ওয়েলেসলি বললে কোন ট্যাক্সিওয়ালা যেতে চাইবে না। কারণ ওটা মুসলমানপাড়া।

তখন ট্যাক্সিতে মিটার সিস্টেম না থাকায় ড্রাইভারটা বলল, 'বালিগঞ্জ—ঠিক হ্যায়, বিশ রুপায়া লাগে গা।' তখনকার দিনে বড় জোর তিন থেকে চার টাকা। কিন্তু মওকা বুঝে কোপ। অনিলদা রাজি হয়ে গেল। ব্যাগ-ব্যাগেজ তুলে দিয়ে আমাদের বলল উঠে বসতে। বসলাম। ড্রাইভার বলল, আধাঘণ্টা ঠায়েরনে পড়েগা।

ব্রিজ জ্যাম। পুলিসের পাত্তা নেই। প্রায় ঘণ্টা খানেক ধৈর্য ধরে বসতে হল। কি অস্বস্তি—কি উদ্বেগ। জীবন বাঁচানোর তাগিদ, হায়রে স্বাধীনতা! হায়রে সাম্প্রদায়িকতা! আজ সবই যেন স্বপ্ন যা একদিন ছিল বাস্তব।

অনেক চেষ্টাব ফলে পাশ কাটিয়ে ট্যাক্সি স্ট্র্যাণ্ড রোডে এল। সোজা দক্ষিণমুখী। তখন ফ্লাইওভার হয়নি। কাস্টম অফিস ছাড়িয়ে হাইকোর্টকে বাঁয়ে ফেলে ট্যাক্সি ঘুরে এল বিধানসভা ভবনের দিকে। তখন স্টেডিয়াম বা আকাশবাণী ভবন ওখানে ছিল না। লাটভবনের পাশ কাটিয়ে উঠল রেড রোডে। আমি অনিলদাকে ইশারায় বললাম এবাব ড্রাইভারকে পার্কস্ট্রিট না বললে বালিগঞ্জের দিকে ছুটবে। ড্রাইভারকে অনেক বুঝিয়ে চৌরঙ্গিতে আনা গেল, কিন্তু পার্কস্ট্রিটের মোড় বরাবর গাড়ি নিয়ে আসতে সে রাজি নয়। যেহেতু ওটা মুসলমান এলাকা। তার পক্ষে নিরাপদ নয় বলে সে মনে করে। অনিলদা মহিলাকে দেখিয়ে বলল আমরা হিন্দু। এখানে খ্রীশ্চান হিন্দু মুসলমান সকলেই থাকে, হাঙ্গামা এ এলাকায় হয় না। কোন চিন্তা নেই। মহিলার শাঁখা সিঁদুর দেখে সে ভরসা পেল। ওয়েলেসলির ট্রাম পার্কসার্কাস যেতে যেখানে মোড় ঘুরছে সেই রয়েড স্ট্রিটের মোড়েই অনিলদার ব্যবসা ও বাসা। ব্যবসা আজও আছে। অনিলদা জীবিত নেই, আছে তার দুই ছেলে। তারাই ব্যবসাগুলি চালায়।

ট্যাক্সি থেকে নামার পর প্রথমে বাচ্চাটা মহিলার কোলে দিয়ে বললাম 'মা, তুমি বাড়ির মধ্যে ঢোক। সে ঢুকে পড়ল। অনিলদা দুখানা দশ টাকার নোট দিয়ে বলল,—

সর্দারজি মাফ্ করনা, মেরা ভাই হ্যায়। মুসলমান হ্যায়। ইস্‌কো বাঁচানেকে লিয়ে হাম ঝুঁট বোলা হ্যায়। আপ বহোত তকলিফ উঠায়া। কোই সুরতসে ইস্‌কো বাঁচানেকা মেরা ধরম হ্যায়।

সর্দারজি তৎমুহূর্তে জবাব দেয়, হাম কিয়া বাঁচায়েগা, ভগওয়াননে বাঁচায়া। যব ধরম কি বাত হ্যায়, তব রুপায়া ওয়াপাশ লে লেনা। আপকা ধরম হ্যায়। মেরা ভি ধরম হয়। রুপায়া লেনেসে মেরা ধরম টুট

জায়েগি।' অনিলদা ইশারা করায় আমি সর্দারজির হাত দুটো চেপে ধরলাম। সর্দারজি জবাব দিল হাওড়া টিকিয়াপাড়াসে পাঁচদফে হাম-লোক মুসলমান বাচ্চা, আওর জেনানাকো লেকার পার্ক সার্কাস ময়দানমে ছোড় দিয়া। সির্‌ফ্‌ ধরম কে লিয়ে। ভাইয়া হাম বহোত খুশ হ্যায়। তুম লোক চলা যাও। হাম ভি জাতা হ্যায়, রুপায়া নেহি লেঙ্গে।

সর্দারজি দ্রুত চলে গেল। আমি ট্যাক্সির নম্বরটা লিখে রাখলাম। পকেট ডাইরিতে নম্বরটা লেখা থাকত।

দিন দুই সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা চলার পর বেঙ্গল চেম্বার্স অফ কমার্সের তৎকালীন সভাপতি ক্যামেরন সাহেব বর্ধমান থেকে আসছিলেন কোলকাতা। তাঁর গাড়িতে ছিল তাঁর মুসলমান বাবুচি। জি টি রোড ধরে আসার সময় হুগলীর কাছ বরাবর তার গাড়ি আটকে মুসলিম বাবুচিকে গাড়ি থেকে নামিয়ে দেবার জন্যে উন্মত্ত জনতা জিদ ধরে। ক্যামেরান সাহেব তাদের সঙ্গে লড়ে যান সমান ভাবে। শেষে তাঁকে প্রাণ দিতে হয় এবং মুসলমান ভদ্রলোককেও তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ডঃ বিধানচন্দ্র রায় সঙ্গে সঙ্গে 'মার্শাল ল' জারি করে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা আয়ত্তে আনেন।

সপ্তাহ খানেক পর রাস্তাঘাট নিরাপদ হলে আমি বেকার হস্টেলে ফিরে আসি।

চার পাঁচ মাস পর ময়দান থেকে খেলা দেখে ফিরছি, মেট্রোর সামনে ট্যাক্সির লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা একটা ট্যাক্সির নম্বর দেখতে দেখতে সেই সর্দারজির ট্যাক্সির নম্বরটা মিলে গেল। আমি ট্যাক্সির কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই কোত্থেকে এসে গেল সেই সর্দারজি। এসেই প্রশ্ন, 'কাঁহা জানা হ্যায় বাবুজি ?' কিছু না বলে চুপ করে রইলাম। দেখলাম আমাকে চিনতে পারে কিনা।

পারল না। ফের জিজ্ঞেস করল, 'কাঁহা জানা হ্যায় সাব।' কিছু না বলে তার হাতটা ধরে টানতে টানতে মেট্রোর দিকে নিয়ে গেলাম। যেন সে অপরাধী এইভাবেই আসতে লাগল। ওখানে ইন্দ্রাণী নামে একটা ভাল মিষ্টির দোকান ছিল, এখনও আছে। সেখানে ঢুকিয়ে বসতে

বললাম—'হাম্‌কো পাছানতা হ্যায়'। সে বার বার তাকিয়েও কিছু ঠাহর করতে পারল না। তখন আমি 'মেরা ভি ধরম হ্যায়। রুপায়া লেনেসে ধরম টুট জায়েগি'-র বর্ণনা করলাম। শুনে সে আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরল। সে কি আকর্ষণ। মানুষের আত্মীয় মানুষ। কোন জাতি নয়। মানুষের মানচিত্রে তার স্থান করে দিলাম—'চিরস্থায়ী' সে মেরা ভাই, মেরা দোস্ত—নাম জগজিৎ সিং। খাওয়া দাওয়া শেষ হলে জগজিৎ শুনল না। তখনই গাড়ি করে নিয়ে গেল ভবানীপুর, তার ডেরায়। তার মা ছেলেমেয়ে ও স্ত্রীকে আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। ঘটনাটাও খুলে বলল, সকলের চোখে জল ; মুখে হাসি। আমার মনে হল ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ আমার ভগ্নতরীখানা মহাপ্রলয়ের পর অক্ষত অবস্থায় তীরে স্থান লাভ করেছে। জগজিতের পরিবারবর্গের সঙ্গে আজীবন আমাদের আত্মীয়তা গড়ে উঠল।

ঠিক দু' বছর পর ১৯৫২ সালে উভয় বঙ্গে যাতায়াতের জন্য পাসপোর্ট ভিসার পত্তন হয়। তখন পূর্ব বাংলার নাম ছিল পূর্ব পাকিস্তান। আমি যথারীতি পাসপোর্ট ভিসা করে পূর্ব পাকিস্তান রওনা হলাম ট্রেনযোগে শেয়ালদহ থেকে। আমার খুড়তুতো বোনের বিয়ে হয়েছিল কুষ্টিয়ার আমলা-সদরপুরে, মীরপুর থানায় পাসপোর্ট এনডোর্স করে তবে সেখানে যেতে হবে। সরকারি আইন। পোড়াদহ নামে একটা স্টেশনে নামলাম। তখন রাত্রি ৮টা, স্টেশনে কোন ইলেকট্রিক ছিল না। গ্যাসের আলো টিমটিম করছে। আবছা আলো, আবছা অন্ধকারে ক্লান্ত শরীর নিয়ে একটা বেঞ্চে কিছুক্ষণ গা গড়িয়ে নিতে ইচ্ছে হল। ব্যাগটা মাথায় দিয়ে শুয়েছি, ঠিক মিনিট দশেকের মধ্যেই একটা চোর এসে হ্যাঁচকা টান দিয়ে ব্যাগটা নিয়ে রেল লাইনে লাফিয়ে পড়ল। ব্যাগের ভিতর টাকা ও পাসপোর্ট ছিল—মুহূর্তকালে ঘাম ছুটে গেল আসন্ন বিপদের কথা চিন্তা করে। তার পিছু ধাওয়া করে আমিও এক লাফ দিলাম কিন্তু লাইনের ওপর তাকে ধরতে পারলাম না। সে লাফ দিয়ে লাইন থেকে প্লাটফর্মের ওপর উঠে পড়েছে, এবার দৌড় দিলেই হয়। আমি ছুটে গিয়ে লাইনের ওপর থেকেই প্লাটফর্মের কিনারায় পৌঁছেই তার পিছনের

কাপড় ধরে টান দিই। ভয়ে গলা শুকিয়ে যাওয়ায় কোন চিৎকার করতে পারিনি। লোকজনও ছিল না। গ্যাসের টিমটিমে আলো। কাপড় ধরে টানতেই লোকটা উলঙ্গ হয়ে বসে পড়ে। সে-ও কোন চিৎকার করেনি। চিৎকার করেনি বলেই সে যাত্রায় প্রাণে বেঁচে গেলাম। সে উলঙ্গ হয়ে গিয়েছিল বলেই চিৎকার করেনি বা দৌড়তে পারেনি, হাজার হোক চোর তো বটে। তারও তো ভয় আছে। ব্যাগটা ধরে টানতেই সে ছেড়ে দিল। তখন আমি কুকুর-হাঁপানো হাঁপাচ্ছি। জিভ বেরিয়ে আসার মত। ব্যাগটা হাতে আসতেই দেখি লোকটা পুরুষ নয়, মেয়ে। তখন আমার কাঁপুনি এসে গেছে। সে চিৎকার করলেই কেসটা অন্য রকম হয়ে যেত। পিঠের চামড়া অক্ষত থাকত না। হয়ত বা মৃত্যুকে বরণ করতে হত। আবার এক লাফ দিয়ে অপর দিকের প্লাটফর্মে উঠে স্টেশন মাস্টারের কাছে গিয়ে বললাম—আমি বিদেশী। বিপদগ্রস্ত।' সারারাত্তির বাইরের বেঞ্চে কাটানো নিরাপদ নয়। আমাকে ভিতরে একটু আশ্রয় দেন। তিনি বললেন, অসম্ভব। আপনি যে ভাল লোক তার প্রমাণ কি? সত্যিই তো তেমন কোন প্রমাণ নেই। কিছু আর বলতে পারলাম না। দু-এক মিনিট দাঁড়িয়ে থেকে বললাম, দাদা একটু জল খাওয়াবেন? তিনি রেগে গিয়ে বললেন. জল-টল এখানে নেই। অগত্যা প্লাটফর্ম ধরে হাঁটতে লাগলাম। শেষ প্রান্তে একজনের সঙ্গে দেখা। বললাম—'দাদা এখানে হোটেল আছে?'

—না। সব মুসলমান হোটেল।

—কোথায় বলুন তো?

দূরে হাত বাড়িয়ে বললেন—

—ঐ যে হ্যাচাগের আলো জ্বলছে। আমি চলতে লাগলাম। মনে হঠাৎ উদয় হল—স্টেশন মাস্টারকে বলেছি 'দাদা একটু জল খাওয়াবেন। এই জল বলার জন্যেই হয়ত আমাকে হিন্দু ভেবেছে। ভাবারই কথা আমিও নির্লজ্জ। জিন্না সাহেবের গড়া পাকিস্তানে কোন্ সাহসে ধুতি পাঞ্জাবি পরে প্রবেশ করি। স্পর্ধা আমার কম নয়, হোটেলের কথা জিজ্ঞেস করায় ঐ একই অবস্থা 'সব মুসলমান হোটেল।' হাসি পেল।

আমি কি হিন্দু হোটেল খুঁজছি। একবার মনে হল, স্টেশনের শেষ প্রান্তে অন্ধকারের মধ্যে ধুতিটা খুলে রেখে লুঙ্গিটা পরি, পাঞ্জাবি থাকলেও কোন অসুবিধে নেই, কিন্তু মনটা বিদ্রোহ করল—ধ্যেৎ, বুকে একটা সাহস গজিয়ে গেল মৌলানা আকরম খাঁর কথা মনে আসতে। মৌলানা আকরম খাঁ তখন পূর্ব পাকিস্তানের মুসলিম লিগের সভাপতি। একচ্ছত্র কিংবদন্তি পুরুষ। ওদেশের মহান নেতা। আমি তাঁর পুত্র খায়রুল আনাম খাঁর পরিচালনাধীন 'পয়গাম' কাগজের সহ-সম্পাদক রূপে কোলকাতা অফিসে কাজ করছি, অতএব পুলিস আমার পরিচয় পেলে তোয়াজ করতে বাধ্য। বুকে সাহস পেলাম। ধুতি পরেই হোটেলে পৌঁছলাম। বেশ পরিষ্কাব পরিচ্ছন্ন এক সিলেটি ভদ্রলোকের হোটেল। লোকটির ব্যবহার অমায়িক। বসে বসে গড়গড়ায় তামাক খাচ্ছিলেন।

আমি বললাম, 'আমি এখানে খেতে চাই।'

—বেশ তো! আমার কাছে ব্যাগটা রেখে ভিতরে হাতমুখ ধুয়ে এসে টেবিলে বসে যান। যা যা খেতে চান ওদের বলে দিন। তাই করলাম। ব্যাগটা ওঁর জিম্বায় রেখে ভিতর থেকে হাতমুখ ধুয়ে এসে ব্যাগটা চেয়ে নিলাম। ধুতিটা মুড়ে ব্যাগে পুরে একটা লুঙ্গি বের করে পরলাম। মনটা ফ্রেশ হল। আর যায় কোথা। লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান। সাবাস বেটা।

টেবিল বয় এসে বলল, 'সাব, কি কি খাবেন।'

—মাছ, ভাত, সবজি, ডাল সবকিছু খাব।

তিলেকের মধ্যে বরিশালের বালাম চালের ভাত। দুধের মত সাদা সীতাভোগের মত মোলায়েম। মনে উদয় হল—ঈশ্বর তুমি কোথা। হঠাৎ সেই মনটাই বিদ্রোহ ঘোষণা করল। এটা পাকিস্তান, এখানে ঈশ্বর টিশ্বর বলা চলবে না। বলতে হবে আল্লাহ্। ঠিকই, মুসলমান যখন তখন আল্লাহ নাম ছাড়া অন্য কিছু চিন্তা করা প্রকৃতই অন্যায়। এ বিষয়ে আমি প্রতিটি মুসলিমের সঙ্গে একমত। যাই হোক হঠাৎ দেখলাম টেবিল বয়টা কীসের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে।

—বললাম, কি হে কী বলছ?

—সাব, মাছ কতটা দেব ?

—যতটা আনতে পার।

দেখলাম—ছুটো ছোট পিরিচে ডাল, সবজি আর ভাতের থালার মত একটা থালায় ইলিশ মাছ. অন্য থালে ভাত। পদ্মার ইলিশ—গন্ধই আলাদা। বড় সাইজের পাঁচ-ছ' পিস মাছ, মাছের মুড়ো, লেজ, ছু-প্রস্থ ডিম। দেখেই চক্ষু চড়কগাছ। কিন্তু মনটা ভরপুর। পেটের ভিতর কর্মকারের হাপর টানছে। কোন সকালে অন্ন উদরস্থ করে শেয়ালদহ স্টেশনে পৌঁছেছিলাম ঠিক স্মরণে আনতে পারছি না। ডাল তরকারি কে ছোঁয়। ভাতের গর্তে ইলিশের ঝোল ঢেলে বৃহদাকার থাবা চালিয়ে বালাম চালের অন্ন যখন উদরস্থ করছি তখন কোনও রাজকন্যা খারাপ ইঙ্গিত করলেও তার ডাকে সাড়া দেবায় মত মানসিকতা আমার ছিল না। মুশকিল হল ইলিশের মাথার কাঁটা বাছা নিয়ে। ছু হাত লাগিয়ে ভোজনপর্ব সমাধা করতে ঘণ্টা খানেক গেল। কিন্তু তৃপ্তি নামের ঈপ্সিত বস্তুটিকে সেদিন হাতের মুঠোয় পেয়েছিলাম।

টেবিল মুছতে এসে অল্পবয়স্ক একটা ছেলে জিজ্ঞাসু ভঙ্গিতে প্রশ্ন করল 'সাব, আপনার বাড়ি ভারত ? ভারত কথা শুনে চমকে উঠলাম। আনন্দও হল, ওদের মুখে ভারত শব্দটা শুনে। কিন্তু পরক্ষণেই চেতনা ফিরে পেলাম ভারত বলতে ওরা পৃথক দেশকেই ইঙ্গিত করে। মুড্‌টাকে পাল্টে নিয়ে বললাম—

তুমি কী করে বুঝলে—আমার বাড়ি ভারত ?

সরলমতি ছেলেটি বলল. ঐ যে অত মাছ খেলেন ? এখানকার লোক – অর্ধেক খায়, অর্ধেক ফেলে রাখে। ভারতের লোক এ সব পায় না, তাই ভাল করে খায়। সবটা খায়।

—ঠিক বলেছ। সাবাস।

—সে আনন্দ পেল—হেসে উঠল।

হাতমুখ ধুয়ে হোটেল-মালিকের গদিতে গিয়ে বসলাম। তিনি গড়গড়ার নলটা বাড়িয়ে দিলেন। বললেন তামাক খান।

—তামাক তো আমি খাই না।

—তবে সিগারেট খান। বলেই একটা 'রমনা' নামে সিগারেটের প্যাকেট বাড়িয়ে দিলেন। পাশে রাখা পানের ডিব্বা থেকে দু খিলি পানও। মনে হল এসবের পয়সা আলাদা দিতে হবে। কিন্তু তা নয়। ভাত মাছ তরকারী ডাল ইত্যাদির বিল হয়েছিল একটাকা মাত্র। তখনও দুদেশের টাকায় ষষ্ঠ জর্জের ছাপ। এক টাকা মিটিয়ে দেওয়ার পর পান সিগারেটের দাম জিজ্ঞেস করায় বললেন, না, না। আপনি মেহমান, ভারত থেকে আসছেন। আমার নছিব ভাল আপনার মত খদ্দের পেয়েছি। বললাম, কেন বলুন তো?

—আমার কোলকাতায় হোটেল ছিল। কোলকাতায় লোককে খাইয়েছি বিশ বছর ধরে। কোলকাতার লোকগুলো খুব ভাল।

তাঁর কথাগুলো শুনে মনে বল পেলাম। আনন্দও হল। আপনজন মনে করে। তখন বলার সাহস পেলাম স্টেশন মাস্টার থাকতে দেয় নি, পানি দেয়নি খেতে। জল আর উচ্চারণ করলাম না। এখন হুঁশিয়ার হয়ে গেছি। ব্যাগ চুরি গিয়েছিল, একটা মেয়ে চোর·। বলার সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধ বললেন, ওরা চাল বিক্রি করে। সুযোগ পেলেই ভদ্রলোকের ব্যাগ চুরি করবে। "ঘাপান" দিতে পারেননি। ঘাপান শব্দটা প্রকৃতপক্ষে কী বুঝিনি। তবে বলার ভঙ্গিমায় বুঝলাম ঘাপান মানে "আষ্টেপৃষ্ঠে প্রহার"।

মনে মনে বললাম আমার বাবার ক্ষমতা—বলেই পরক্ষণে মনে মনেই সংশোধন করে নিলাম, আমার বাবার নয়, আমার বাপের ক্ষমতা 'ঘাপান' দেব—মেয়েটা চেঁচালে আমার ইহজন্ম সাঙ্গ হত তিলেকের মধ্যে।

বৃদ্ধ বললেন—কোথায়ও থাকতে হবে না—আপনি মীরপুর যাবেন ভোর ৪টের ট্রেন। পাবনা যাবে সারা ব্রিজ হয়ে, তার আগেই মীরপুর স্টেশানে নামবেন। আমি উঠিয়ে দেব। আপনি ভিতরের ঘরে বিশ্রাম করবেন। পাশের খাটে থাকব আমি। বলেই বৃদ্ধ সঙ্গে করে ভিতরে নিয়ে গিয়ে অতিথিদের জন্য নির্দিষ্ট খাটে ধোয়া বিছানার চাদর ও সুন্দর একটা বালিশ এনে দিয়ে বললেন—এখানে আপনি শোবেন। পাশের খাটে থাকব আমি কোন ভয় নেই আপনাকে ৪টের ট্রেনে উঠিয়ে দেব।

আত্মার আত্মীয়ের সন্ধান পেলাম পূর্ব পাকিস্তানে—১৯৫২ সালের এক শুভলগ্নে। আল্লাহ্ সবই তোমার কুদরত।

ক্লান্তদেহ। অচিরেই ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ি। ঠিক সাড়ে তিনটেয় বৃদ্ধ আমাকে ডেকে তুললেন। ভোর ৪টেয় ট্রেন। মুখটা ধুয়ে স্টেশনের দিকে পা বাড়ালাম। বৃদ্ধ হাতে হাত ঠেকিয়ে শেক্‌হ্যাণ্ড (মুসাবা) করল। আবার আসবেন। ফেরার পথেও আসা চাই অঙ্গীকার করে নিয়ে আমার দিকে চেয়েই রইলেন।

দ্রুত স্টেশনের দিকে পা বাড়িয়ে টিকিট কাটার ক' মিনিট পরই ট্রেন এসে গেল। সকাল ঠিক ৫টার মধ্যে মীরপুর স্টেশনে পৌঁছলাম। প্লাটফর্ম পার হতেই একটা দোকানে দেখলাম গরম গরম লুচি ভাজছে, ঘিয়ের লুচি। ঘিয়ের সুগন্ধে চারিদিক মাতোয়ারা। লোভ সংবরণ করতে পারলাম না। কয়েকজন ভদ্রলোক খাচ্ছেন দেখে পাশের বেঞ্চে বসে পড়লাম। ৮ খানা লুচি ও তরকারী সহকারে জলযোগ সারলাম, পরে এককাপ চা।

দামটা ঠিক কত নিল মনে করতে পারছিনা, তবে পূর্ব পাকিস্তানে তখনও দাল্‌দার আবির্ভাব ঘটেনি। অনেকে দাল্‌দার নামই শোনেনি।

পৌনে ৬টার সময় মীরপুর থানায় হাজির হলাম। সেই ধুতি পাঞ্জাবি পরেই গেছি। ইচ্ছে করেই—কারণ মৌলানা আকরাম খাঁর পুত্রের কর্মচারী আমি। বুকের পাটা অনেকখানি বেড়ে গেছে। সঙ্গে প্যাণ্ট, শার্ট, পাজামা, লুঙ্গি সবই ছিল কিন্তু রীতিমত অভিজ্ঞতা অর্জনের নেশায় তখন বুঁদ হয়ে রয়েছি।

থানায় কেউ নেই। টেবিল চেয়ার বেঞ্চ শূন্য। দূরে দু-একজন সিপাই কনস্টেবল দাঁতন করছে।

প্রায় আধঘণ্টা নিশ্চুপ বসে রইলাম, দু-একজন ঘরে ঢুকেও কথা কইল না—মনে হল পরনে ধুতি থাকার দরুণ আমি কাফের বা মালাউন শ্রেণীভুক্ত অর্থাৎ গোঁড়া হিন্দু। সুতরাং ঘৃণার বস্তু। ঠিক ঘণ্টা খানেক পর থানার ওসি যাকে এদেশে বড়বাবু বলি, তিনি ইউনিফর্ম পরে ঘর ঢুকলেন এবং সামনের চেয়ারে জাঁকিয়ে বসলেন। ইত্তেহাদ

নামক একটা খবরের কাগজে মনোনিবেশ করলেন, হাতে সেই প্রসিদ্ধ বমনা সিগরেট।

আমি অনেকখানি দূরে একটি বেঞ্চের এককোণে চুপচাপ বসে। প্রায় বিশমিনিট পরে এক সিপাই এসে সামনে দাঁড়াল। বড়বাবুর ইঙ্গিতে আমার কাছে এসে সিপাইটা জানতে চাইল আমি কাকে চাই। জবাবে 'বড়বাবুকে' চাই বলতে প্রচণ্ড এক ধমক খেলাম—বড়বাবু কি, বড়বাবু—বড় সায়েব বলতে হবে। ভারতের মাকৃড়া—কী জন্যে এদেশে আস।—কথা বলতে শেখনি।

বুঝলাম—আমার ধুতিই দায়ী।

বিনয়ের সুরে নিবেদন করলাম বড় সাহেবকে চাই। তখন বড় সাহেব আমার দিকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন। আমি ধীরে ধীরে কাছে গিয়ে হাতটা কপালে ঠেকিয়ে আদাব সালাম কি নমস্কার কি যে জানালাম তা তিনি লক্ষ্যই করলেন না। ভয়ে ভয়ে পাসপোর্টটা আস্তে আস্তে তাঁর সামনে নামিয়ে দিতেই পাশপোর্টটা ভালভাবে না দেখে ছুড়ে ফেলে দিয়ে বললেন—পাকিস্তানে কী দরকার। চোরাচালান করছেন কতদিন। এদেশে আসতে লজ্জা লাগে না।

অপরাধীর মত দু-হাত কচলে বললাম আত্মীয়ের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।

সবাই সে কথা বলে—যত সব মালাউনের দল—তারপর কী যেন মনে করে পাসপোর্টটা হাতে তুলে আমার ফটোটা মিলিয়ে নিয়ে নিচের নামটা দেখলেন সেখ মহম্মদ ইসমাইল। তখন চক্ষু ছানাবড়া।

—আপনি মুসলমান?

আজ্ঞে হ্যাঁ বলতে গিয়ে জিভটা আটকে গেল। বললাম জি হ্যাঁ।

—তা ধুতি পরা কেন?

—হাদিসে ধুতি পরতে তো কোন নিষেধ নেই। মুসলিমদের ধুতিপরা নিষেধ ধর্মশাস্ত্রে কোথাও পাইনি। তাই ওটা পরতে আমাদের বাধে না।

—তা, কোথা যেতে চান?

—আমলা সদরপুর।

—ওখানে কে আছে ?

—ভগিনীপতি মানে বোহনাই।

—হ্যাঁ বুঝলাম। হিন্দুয়ানি শব্দ ব্যবহার করতে আপনারা অভ্যস্ত।

—কে বোহনাই—নাম কি ?

—করিম সাহেব।

—অধ্যাপক করিম সাহেব ?

—জি হ্যাঁ।

—কী রকম বোহনাই ?

—চাচাতো।

—আপন চাচাতো

—জি হ্যাঁ।

চুপ করে রইলেন—তথাকথিত বড়সাহেব। একটু পরে বললেন, আমার সঙ্গে আসুন। আমাকে তাঁর কোয়ার্টারে নিয়ে গিয়ে সযত্নে বসতে দিলেন খুব উন্নতমানের একটা সোফায়।

বড়সাহেবের পার্লারটা দেখার মত। সুসজ্জিত। সোফায় বসে একটা দৈনিক পত্রিকায় নজর দিচ্ছি, পর্দা ঠেলে একটা কিশোরী পরিচারিকা নাস্তার প্লেট ও চা এনে হাজির করল। প্লেটটা দেখেই বুঝলাম অদূরে যে দোকানে বসে লুচি তরকারি খেলাম সেই দোকানেরই রুচিকর নাস্তা। খাঁটি ঘিয়ের তৈরি—লুচি ও সুন্দর আলু-পটলের তরকারি।

'ভাগ্য! তুমিও মাঝে মাঝে রসিকতা কর।' সেদিন প্রমাণ পেলাম ভালভাবেই।

খাওয়া-দাওয়া সবে শেষ হয়েছে, বাইরে মোটর-সাইকেলের শব্দ পেলাম। শব্দ পাওয়া মাত্রই বড়সাহেবও ভিতর থেকে পর্দা ঠেলে ঢুকলেন পার্লারে—উল্টোদিক থেকে অধ্যাপক করিম। উভয়ে করমর্দন

করার পর বড়সাহেব বললেন, 'একজন আসামী পেয়েছি, তোমার অপেক্ষায় আটকে রেখেছি।'

আমার প্রতি নজর পড়তেই করিম সাহেব ছুটে এসে করমর্দন করলেন। কী ব্যাপার? এত সকালে এখানে? কোত্থেকে? তখনও আমি নির্বাক—যেন অভিনয় দেখছি। বড়সাহেব আমার বাঁ-দিকে বসলেন, করিম সাহেব ডান-দিকে। যা কিছু বলার বড়সাহেবই বললেন। আমার সঙ্গে প্রাথমিক দুর্ব্যবহারের জন্য অধ্যাপক করিমের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিলেন। করিম সাহেব গম্ভীর হয়ে গেলেন। কি যেন চিন্তা করছেন তিনি। আমার মনে হল, করিম সাহেবের মনটা খারাপ হয়ে গেল। তৎমুহূর্তে বড়সাহেব করিম সাহেবের হাত ধরে ভিতরের ঘরে ঢুকলেন। আমি একাকী বসেই রইলাম।

পথে আসার সময় করিম সাহেবের মুখে শুনলাম—ভিতরের ঘরে গিয়ে আমার প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। আমি এসেছি আমার চাচাতো বোনের (করিম সাহেবের স্ত্রী) সঙ্গে দেখা করতে। তারপর যাব ঢাকা। মৌলানা আকরম খাঁ সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে। সে সময় আকরম খাঁ মানেই পাকিস্তানের প্রথমশ্রেণীর নেতা। ভীষণ প্রভাবশালী লোক।

একথা শুনেই বড়সাহেবের মুখ চুন। করিম সাহেবকে তাঁর অনুরোধ, তিনি যেন আমাকে শান্ত করেন এবং ফেরার আগে তাঁর ওখানে আতিথেয়তা গ্রহণ করার ব্যবস্থা করেন। সব শুনে আমি হাসলাম। অবশ্য আসার সময় হাতে হাত দিয়ে আন্তরিকতা জানিয়ে ছিলেন বড়সাহেব।

দিন সাতেকের মধ্যে ওপারের কাজ সেরে স্বদেশে ফিরছি। দর্শনা স্টেশনে নেমে পাসপোর্ট চেকিং ও এক্সিট সিল দেওয়ার জন্য স্টেশনে কর্মরত 'বড়সাহেবের' কাছে গিয়ে হাজির হতে হল। স্টেশনে ট্রেন পৌছানোর সঙ্গে সঙ্গে এক অফিসার এসে প্রত্যেকের পাসপোর্ট নিয়ে বড়সাহেবের টেবিলে জমা দিয়েছিলেন। আনার সময় নিজেকে গিয়ে নিয়ে আসার নিয়ম। দু ঘণ্টার মত চেকিং হওয়ার পর ট্রেন ছাড়ার

নিয়ম। আমি কিছুক্ষণ পরেই নিজের পাসপোর্ট আনার জন্য বড়সাহেব যেখানে জাঁকিয়ে অফিস করে বসে আছেন সেখানে গেলাম। কিন্তু হাজার দুয়েক লোকের ভিড় দেখে বড়সাহেবের পিছন দিকটায় জনশূন্য থাকায় আমি বড়সাহেবের চেয়ারের পিছনে যেইমাত্র গিয়ে দাঁড়িয়েছি মুহূর্তমধ্যে এক কনস্টেবল ঝাঁপিয়ে পড়ে আমার জামার কলার ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে গেল। হাতে ডাণ্ডা ছিল—ডাণ্ডা তুলে মারে আর কি! বললাম, মারার দরকার নেই, কেন ধরে আনলেন জানতে চাই। আমি কে আগে জানুন তারপর ডাণ্ডাপেটা করবেন। শুনেই লোকটা হকচকিয়ে গেল। ডাণ্ডা নিচে নামিয়ে বলল, আপনি কি বড়সাহেবের কোনও পরিচিত বা আত্মীয়? বললাম, না। বলামাত্র আরও গরম হয়ে ধমকের স্বরে বলল, জানেন না বড়সাহেবের পিছনে দাঁড়ানো নিষেধ। বললাম, কেমন করে জানব। এবারই তো প্রথম আসা। ভাগ্যিস সেদিন আমার পরনে ফুলপ্যান্ট হাওয়াই শার্ট ছিল, ধুতি থাকলে ডাণ্ডা মশায় অচিরেই আমাকে ঠাণ্ডা করে দিত। কারণ ধুতি ছিল ওদের মতে হিন্দুদের পোশাক—যারা ওদের ঘোর শত্রু।

তার পরের প্রশ্ন---আপনার নাম কি? নামটা বলতেই একটু নরম হল। তার পরের প্রশ্ন—দেশ কোথায়? জবাবে বললাম, বর্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার অমুক গ্রামে। শুনেই সে জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে মোলায়েম সুরে বলল, ঐ গ্রামের অমুককে চেনেন? বললাম, হ্যাঁ তিনি আমার দাদা।

—আপন দাদা।

—হ্যাঁ।

জোঁকের মুখে নুন পড়ার মত গুটিয়ে গেল লোকটা। আমাকে দাঁড় করিয়ে রেখে বড়সাহেবের টেবিলের কাছে গিয়ে আমার পাস-পোর্টটা তুলে নিয়ে আমার ফটোটার সঙ্গে মিলিয়ে দেখে বলল, এটাই তো আপনার পাসপোর্ট।

বললাম হ্যাঁ।

আমার সঙ্গে আসুন। বলে পুলিস ক্যাম্পের পিছনে তার

কোয়ার্টারে নিয়ে গিয়ে বসাল। কিছুক্ষণ পর—ভিতর থেকে টিফিন এল। দুজনেই টিফিন করলাম, খেতে খেতে লোকটি বলল, আপনার দাদা আমার সহপাঠী। আপনাদের গ্রাম থেকে একমাইল দূর অমুক গ্রামের লোক আমি। আমার মা বাবা এখনও ওখানে আছে। আমি চাকরি করি—এখানে লোকের হাত দিয়ে টাকা পাঠাই। আপনি আমার বাবাকে এই চিঠিটা দিয়ে দেবেন—বলেই একটা চিঠি আমার হাতে তুলে দিল। তারপর জাঁকিয়ে বসে বলল, আপনি আমার বন্ধুর ভাই—সুতরাং এখন আর বলতে আপত্তি নেই। যে বড়সাহেব পাসপোর্ট চেক করছেন ওঁর আগে এখানে যিনি ছিলেন তাঁর অন্যায়ের জন্যই বড়সাহেবের পিছনে কাকেও দাঁড়াতে দেওয়া হয় না। বড়সাহেব ওখানে বসাকালীন আমাদের চার-পাঁচজনকে ওয়াচ রাখতে হয়। ব্যাপারটা খুবই জঘন্য।

বললাম—জানতে পারি কি ?

—নিশ্চয়ই। এক পাঞ্জাবী মুসলিম ফ্যামিলি এদেশ থেকে কোলকাতা যাচ্ছিল। তাদের পাসপোর্টের ত্রুটি আছে এই অভিযোগে তাদের ফেরত যাওয়ার নির্দেশ দেন সেই বড়সাহেব। কিন্তু তাঁরা সংখ্যায় বেশ কয়েকজন থাকায় সকলকে পুনর্বার ঢাকা অবধি ফেরত নিয়ে যাওয়া অযৌক্তিক বিবেচনা করে মূল মালিক সকলের পাসপোর্ট সংশোধনের জন্য একাই ঢাকায় যান এবং উক্ত বড়সাহেবের ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে তাঁর নিজের কোয়ার্টারে দু-এক রাত্রির জন্য তার পরিবারবর্গের থাকার ব্যবস্থা করে যান। খাওয়া-দাওয়ার ঝঞ্ঝাট এড়াতে হোটেলের বন্দোবস্তও করে যান। দুদিন পরে ফিরে তিনি তাঁর স্ত্রীর কাছে রিপোর্ট পান উক্ত বড়সাহেব তার বিশবছর বয়সী পরমাসুন্দরী কন্যার শ্লীলতাহানির চেষ্টা করেছেন, যার জন্য সকলকে দুরাত্রি জেগে কাটাতে হয়েছে। শুনে ভদ্রলোক ক্ষিপ্তপ্রায় হয়ে আর কোলকাতা না গিয়ে ঢাকায় ফেরত যান এবং কয়েকজন লোককে সঙ্গে এনে স্টেশন চত্বরে ঘোরাফেরা করতে থাকেন। সুযোগমত সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হওয়ার পরপরই এককোপে বড়সাহেবের মুণ্ডু পাত করে গা-ঢাকা দেন তাঁরা। আসামীকে সন্দেহবশত

ধরা হলেও প্রমাণ অভাবে বেকসুর খালাস দেওয়া হয়। তার পর থেকে চেকিং-এর সময় বড়সাহেবের পিছনে দাঁড়ানো একেবারে নিষিদ্ধ হয় এবং কড়া পাহারার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

বললাম—উপযুক্ত ডাণ্ডা আমার ভাগ্যেও জুটেছিল। তবে দুর্ভাগ্য তা আর উপভোগ করতে পারলাম না।

কথাটা শুনে, চেয়ে দেখি, লোকটার মুখটা কেমন যেন হয়ে গেল। বলল, কী করি বলুন—চাকরি করি, তার ওপর আপনি তখন অপরিচিত।

সেদিন আমার আর ফেরা হয়নি। ওর আতিথেয়তা গ্রহণ করতে হয়েছিল। পরেরদিন পাসপোর্টের সিলসহ সব কিছু করিয়ে আমাকে ট্রেনে বসিয়ে দিয়ে 'সি অফ' করেছিল। দর্শনা থেকে গেদে বর্ডার হয়ে যখন স্বদেশের হাওয়া গায়ে লাগল তখন মনে হল স্বর্গে আসার প্রমোশন পেলাম।

তবে আর একবার ওদেশে যেতে হয়েছিল। সে ঘটনা আরও চমকপ্রদ। পূর্ব পাকিস্তান ধ্বংস হয়ে 'বাংলাদেশ' জন্মগ্রহণ করায় নরক স্বর্গেই পরিণত হয়েছে। এখন সেটা গণতান্ত্রিক স্বাধীন দেশ। আমাদের প্রতিবেশী দোসর—খুবই শান্তির কথা। কিন্তু 'বাংলাদেশ' জন্মগ্রহণ করার পর আর সেখানে যাওয়ার সুযোগ হয়ে ওঠেনি। ভবিষ্যতে সুযোগ ঘটলে খুশিই হব।

দ্বিতীয় দফায় ওদেশে যাওয়ার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা করছি। দিবালোকের মতই স্পষ্ট আমার কাছে। ঘটনাটা ১৯৬৭ সালে 'আয়ুব শাহী'র যুগ। তার চার বছর পরে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম।

আমার এক ঘনিষ্ঠ আত্মীয় আমার সম্পত্তি আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে আমার বিরুদ্ধে বেশ কয়েক দফা মিথ্যা মামলা রুজু করে। কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রে সে পর্যুদস্ত হয়। শেষমেশ অন্য আত্মীয়ের মধ্যস্থতায় আমার সঙ্গে ভাব জমায়। তার সাংসারিক অনটন এমন পর্যায়ে পৌঁছয় যে বিবাহযোগ্যা দু'দুটি কন্যাকে পাত্রস্থ করা তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে ওঠে। অনেকেরই সুপারিশে তাকে আর্থিক সাহায্য দিই। স্বল্প

ব্যয়ে তার কন্যা সম্প্রদানের কাজ যাতে সম্পন্ন হয় তার ব্যবস্থাও করি। বছর চারেক অতিবাহিত হওয়ার পর বিনা প্ররোচনায় তার সুপ্ত জিঘাংসা-প্রবৃত্তি আবার জেগে ওঠে—কন্যাদায় থেকে মুক্তি পাওয়ার পর দ্বিতীয় দফায় আমার সম্পত্তি দখল অথবা অর্থ আদায়ের ফন্দি আঁটে।

১৯৬৭ সালের কথা। সে লোক ঢাকা থেকে ফিরে এসে খবর দিল: চট্টগ্রামে আমার শ্বশুরসাহেব শয্যাশায়ী, সে নাকি এক আত্মীয়ের মুখে শুনেছে, সে সময় সে আমার পরম হিতৈষী। পরদিনই একটা টেলিগ্রাম পেলাম চট্টগ্রাম থেকে সত্যিই শ্বশুর সাহেব নার্সিংহোমে ভর্তি আছেন। টেলিগ্রামের সাহায্যে—পূর্ব পাকিস্তান যাওয়ার ভিসার ব্যবস্থা সেই-ই করে দেয়।

আমি চট্টগ্রাম চলে গেলাম। শ্বশুর সাহেব চট্টগ্রামের একজন শিল্পপতি। দেশ ভাগের পূর্বে এদেশেই বাড়ি ছিল এবং দু-দেশেই তাঁর ব্যবসা ছিল। যাই হোক সেখানে গিয়ে দেখি তিনি আরোগ্যের পথে। চার-পাঁচদিন পরই তিনি নিজের বাড়িতে ফিরে এলেন, আরও দুদিন থেকে আমি দেশে ফিরলাম। মাত্র এক সপ্তাহের ভিসা ছিল। সেটাই আমাকে ভাগ্য বিপর্যয় থেকে বাঁচিয়ে ছিল। আমি সেখান থেকে বিদায় নিয়ে চলে আসার কয়েক ঘণ্টা পরই ঢাকা থেকে গোয়েন্দা বিভাগের অফিসার আমার শ্বশুর সাহেবের চট্টগ্রামের বাড়িতে হাজির। আরও সৌভাগ্য স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে পড়ার সময় ঐ গোয়েন্দা অফিসার ছিলেন আমার শ্বশুরের সহপাঠী। দুই বন্ধুতে বিশদ আলাপের পর ভদ্রলোক সহপাঠীর কাছে কিছু গোপন করলেন না, অবশ্য অসুস্থ শ্বশুর সাহেবকে আশ্বাস দিলেন কোনও চিন্তা নেই—তিনি যা রিপোর্ট পাঠাবেন তা শ্বশুর সাহেবকে দেখাবেন যাতে তিনি অসুস্থ শরীরে শান্তি পান। ভদ্রলোক সেদিন আমার শ্বশুর সাহেবের বাড়িতে রয়েই গেলেন।

আমার সেই আত্মীয় আমাকে পূর্ব পাকিস্তানে বন্দী করে রাখার চেষ্টায় তাঁর শ্যালক যিনি ঢাকা গোয়েন্দা দপ্তরে চাকরি করেন, তাঁর সাহায্যে আমার বিরুদ্ধে একটা অভিযোগ সেখানে পেশ করে। যদিও সেটা হুবহু মিথ্যা। সে সময় দোর্দণ্ডপ্রতাপশালী সামরিক শাসক

আয়ুব খাঁ পাকিস্তানের সর্বময় কর্তা। ভীষণ কঠোর প্রকৃতির শাসক। তাঁর সময়ে পাকিস্তানে কম্যুনিজম্ ব্যাণ্ড করা হয়। কম্যুনিস্ট নামধারী কেউ ধরা পড়লে তার কারাগারে স্থান হত।

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় তখন শেখ মুজিবর রহমান সাহেব কারা-বন্দী। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর তিনি হন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব।

শেখ মুজিবর রহমান সাহেব কলকাতায় ইসলামিয়া কলেজে পড়তেন। থাকতেন সরকার পরিচালিত 'বেকার হস্টেলে।' আমিও ঐ কলেজের ছাত্র ছিলাম এবং ঐ একই হস্টেলে থাকতাম। তবে আমার আমলে ঐ কলেজের নাম হয় সেন্ট্রাল ক্যালকাটা কলেজ। মুজিবর রহমান আমার অপেক্ষা বেশ কয়েক বছরের সিনিয়র। তিনি ছিলেন আমার মামার সহপাঠী।

ঢাকার গোয়েন্দা দপ্তরে অভিযোগ পেশ হয় মিথ্যা তথ্য জড়িয়ে একটা জাল বিস্তার করে। প্রথম অভিযোগ, আমি সেই ইসমাইল সাহেব যিনি পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন মুখমন্ত্রী ডঃ বিধানচন্দ্র রায়ের বিরুদ্ধে ভোটে দাঁড়িয়েছিলাম। কিন্তু আদৌ তা নয়। তিনি প্রখ্যাত কম্যুনিস্ট নেতা মহম্মদ ইসমাইল। দ্বিতীয় অভিযোগ হল, আমি নাকি মুজিবর রহমানের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছি। একই কলেজের ছাত্র। পূর্ব পরিচিত, রাজনৈতিক বিশেষ তথ্য সংগ্রহের জন্যই পূর্ব পাকিস্তানে আমার গোপন ভাবে ঘোরাফেরা।

অভিযোগের অনুলিপি তৎকালীন সমগ্র পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদে পাঠানো হয়। প্রেসিডেন্ট আয়ুব খাঁনের দপ্তর থেকে জরুরি বার্তা আসে ঢাকা গোয়েন্দা দপ্তরে—

> "অ্যারেস্ট হিম্ ইমিডিয়েটলি
> অ্যাণ্ড সেণ্ড টু ইসলামাবাদ।"

এই বার্তার প্রেক্ষিতে গোয়েন্দা অফিসারের আগমন আমার শ্বশুরালয়ে। অভিযোগপত্রে অবশ্যই আমার গন্তব্যস্থলের উল্লেখ ছিল।

যাই হোক, গোয়েন্দা অফিসারটি শ্বশুর সাহেবের বাচনিক সবকিছু শুনে সেখানেই রিপোর্ট লিখে তাঁকে দেখিয়েছিলেন—

"উই আর অল মিসগাইডেড, দি এলিগ্‌ড্‌ পারসন ইজ অ্যানাদার ইসমাইল, হু হ্যাজ নো লিঙ্ক উইথ দি ফেমাস কমিউনিস্ট লিডার মহম্মদ ইসমাইল।"

এরপর আর কোনও প্রতিক্রিয়া ঘটেনি। উপরোক্ত ঘটনাটি বিস্তারিতভাবে শ্বশুর সাহেবের পত্রে জানতে :পেরেছিলাম, কিছুদিন পর।

পরের দিনের অধিবেশনের আরম্ভেই পাঁচির দুই পুত্রবধূ আমাকে বলল, দাদু আপনার কাছে কয়েকদিন যাবৎ দুঃখের কাহিনী শুনছি, আপনার জীবনে কোন্ কোন্ ঘটনায় শান্তি পেয়েছেন, সেরকমের দু-একটা কাহিনী আমরা শুনতে চাই—সে সব শুনলে আমরাও আনন্দ পাব।

উত্তরে বললাম—চমৎকার প্রশ্ন। কেবল দুঃখের কাহিনী শুনে দুঃখকেই ডেকে আনা হচ্ছে—শান্তি পেতে হলে শান্তির আশ্রয় নেওয়া উচিত।

……অন্তরে গেঁথে রাখার মত আমার জীবনে কয়েকটা ঘটনা ঘটেছে, সেগুলো অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে উপলব্ধি করলে চোখের সামনে ভেসে ওঠে—তৃপ্তিও পাই খুব। কিন্তু একটা কথা—এ সবের শেষ কাহিনীটা আমার বিবাহিত জীবনের সঙ্গে জড়িত, সুতরাং শুধু আমার ইচ্ছের ওপরই সে কাহিনীর বর্ণনা নির্ভর করছে না, যেহেতু তোমাদের দিদা এখানে উপস্থিত সেহেতু এ সবের বর্ণনা করতে হলে তাঁর সম্মতিও প্রয়োজন।

কথাটা শুনে আনন্দের জোয়ার বয়ে গেল। স্বপন, তপন, নাতবৌরা আমার স্ত্রীর সম্মতির জন্যে জিদ ধরল। সম্মতি পাওয়া গেল—তবে শেষ অধিবেশনে তা ব্যক্ত করার নির্দেশ পেলাম। অর্থাৎ কোলকাতা ফিরে যাওয়ার ঠিক আগের সন্ধ্যায় এর বিশদ বর্ণনা করে সকলকে আনন্দের জোয়ারে ভাসিয়ে দেওয়া হবে—এটাই তার অভিমত। আমিও সমর্থন করলাম।

আরও জানানো হল, পরের বারে যখন পুনরায় গ্রামের বাড়িতে

আসা হবে তখন আরও নানা ঘটনা শুনিয়ে সকলকে খুশি করা হবে। এইভাবে আমাদের জীবনটা আনন্দের মধ্যে অতিবাহিত হোক সেটাই একান্ত ইচ্ছা।

সেদিনের অধিবেশনে কয়েকটা ঘটনার বর্ণনা করতে হল। সকলেই আগ্রহ সহকারে শুনতে লাগল।

১৯১১ সালের কথা। আমেদাবাদ মেলে আজমীঢ় থেকে আগ্রা আসছি। সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায় আমেদাবাদ মেল আজমীঢ় স্টেশনে পৌঁছাল। আমাদের থ্রি টায়ার কোচে রিজার্ভেশন ছিল। সঙ্গে ছিল এক বন্ধু, কামরায় উঠে কথাবার্তা বলছি, পাশের ঘেরা লেডিস কমপার্ট-মেণ্ট থেকে এক অল্পবয়স্কা বাঙালী মহিলা বেরিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল,—দাদা, আপনারা বাঙালী? বললাম, অবশ্যই। কেন বলুন তো? মহিলা ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলল। উৎসুক হয়ে আমি ও আমার বন্ধু তুজনেই তার কাছাকছি এসে জিজ্ঞেস করলাম কি হয়েছে বলুন? কাঁদতে কাঁদতেই বলল, আমার বাচ্চাটা সারাদিন তুধ পায়নি। কামরায় আমি একা, বাক্সে গয়না পত্র আছে। কোনও স্টেশনে নামতে পারছি না তুধ কিনব বলে। বুকের তুধ খাইয়ে এতদূর আনছি। বাথরুমেও যেতে পারছি না। ভয় হচ্ছে গয়নার বাক্স নিয়ে কেউ পালাবে। আমি একলা বুঝে কয়েকজন তুর্বৃত্ত ঘোরাফেরাও করছে, টি টি আইকেও বিশ্বাস করতে পারছি না। যারা ঘোরাফেরা করছে ওরা ওরই সঙ্গী বলে আমার ধারণা হয়েছে।—

কথাগুলো শুনে মাথা গরম হয়ে গেল কিন্তু বুকে বল পেলাম। কোত্থেকে উদ্দীপনা এল জানি না শরীরে যেন অসুরের মত বলও পেলাম। প্রবাসে এক বাঙালী অসহায় মহিলা কষ্ট পাবে। আর আমরা এমনই কাপুরুষ হয়ে থাকব যে তাকে সাহায্য করতে পারব না। এতে সারাজীবনই কষ্ট পাব, যখন কথাগুলো মনে হবে।

মহিলাকে বললাম—"আমি আপনার নিজের দাদা। আমার নিজের বোনও কোথাও না কোথাও যদি এ ধরনের বিপদে পড়ে।

বাঙালীরা স্বদেশে ঝগড়া করি কিন্তু বিদেশে আমাদের বন্ধুত্ব অটুট থাকে। আপনাকে তাই তুমিই বলব, আমার নির্দেশ শিগ্‌গির বাথরুম থেকে ঘুরে এস। আমি আমার বন্ধুকে দরজায় দাঁড় করিয়ে রাখছি। মেয়েটা চোখ মুছতে মুছতে বাথরুমের দিকে চলে গেল। আমার বন্ধু পল্টুকে বললাম, তুমি এখানে দাঁড়াও। এক পা নড়বে না, আমি না আসা পর্যন্ত। সে দাঁড়িয়েই রইল। আমি ঘড়িটা দেখে নিলাম ট্রেন ছাড়তে তখনও দশ মিনিট দেরি। প্লাটফর্মেই গরম দুধ বিক্রি হচ্ছে। মেয়েটার জন্য কয়েক পিস টোস্ট ও সিদ্ধ ডিম, নিলাম এবং বাচ্চাটার জন্যে মাটির ভাঁড়ে গরম দুধ নিলাম। ট্রেনে উঠে দেখছি পল্টু ঠিক 'জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। মেয়েটা চোখমুখ ধুয়ে মুছতে মুছতে আসছে। আমার হাতে খাবার দেখে সে বুঝতে পেরেছে। কামরায় ঢুকেই বাক্স থেকে মানি ব্যাগ বের করে টাকাটা দেওয়ার চেষ্টা করছে। ধমকের সুরে বললাম, টাকা দেবার চেষ্টা করো না। যা বলছি শোন। প্রথমে বাচ্চাটাকে দুধ খাওয়াও, বাকিটা ফ্লাস্কবন্দী কর। ওর খাওয়া হলে তুমি এগুলো খেয়ে নাও। তোমার ওয়াটার বটল দেখি। জলের পাত্রটা নিয়ে আবার স্টেশনে নেমে জল ভরে কামরায় উঠি। জলের পাত্রটা ওকে দিই—তারপর বলি আগে তোমরা খেয়ে নাও তারপর কাহিনী শুনব—এরকম অসহায় অবস্থা কেন?

পল্টু ও আমি বাইরে অপেক্ষা করতে থাকি। ইতিমধ্যে টি টি আই একবার রাউণ্ড দিতে এসেছে। বললাম, আমার ফ্যামিলি আছে ভিতরে। টিকিট রিজার্ভেশন সব দেখতে চাইল। ভিতর থেকে ওগুলো এনে দেখানোর সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রলোক চলে গেলেন। আমি তাঁকে ডেকে বললাম, অনুগ্রহ করে মার্শালকে বলে যান, লেডিস কম্পার্টমেণ্টে আমার ফ্যামিলি আছে, যেন সতর্ক থাকে। তিনি হাত নেড়ে আশ্বাস দিয়ে গেলেন।

মেয়েটির খাওয়া-দাওয়া শেষ হলে, ডাকল, দাদারা ভিতরে আসুন। বসলাম ভিতরে। তার কাহিনী শুনলাম।

আগ্রার আগের স্টেশন 'ইদ্‌গা'। ঐ ইদ্‌গা স্টেশনের কাছ বরাবর ওদের ফ্ল্যাট। স্বামী ইঞ্জিনিয়ার, আগ্রাতে কর্মস্থল। ননদের কাছে বেড়াতে গিয়েছিল আমেদাবাদে। স্বামী ট্রেনে উঠিয়ে দিয়ে গিয়েছিল। ননদের স্বামীকে আমেদাবাদে টেলিগ্রাম করে জানিয়ে দিয়েছিল। তিনি স্টেশনে এসে নিয়ে গিয়েছিলেন কিন্তু সেখানে পৌঁছনোর সঙ্গে সঙ্গে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই আমাকে ফিরতে হল। ঐ অঞ্চলটা কলেরায় আক্রান্ত, এমনকি ননদের পাশের ফ্ল্যাটেও, অগত্যা ননদাই পাল্টা একটা টেলিগ্রাম করে আমাদের ট্রেনের টিকিট কেটে বসিয়ে দিল, আমরা সেখানকার খাবার খাইনি। স্টেশনে অল্প গরম দুধ বাচ্চাটার জন্যে নিয়েছিলাম তাও মাঝপথে শেষ হয়ে গেছে।

শুনে বললাম, ঈশ্বর মঙ্গলময়, তোমরা সুবিবেচনার কাজ করেছ। আর চিন্তা নেই, আমরা 'ইদ্‌গা' স্টেশনে যদি দেখি তোমার স্বামী এসেছেন তোমাদের নিতে, তাহলে আমরা আগ্রা চলে যাব। যদি দেখি তিনি আসেননি তাহলে ইদ্‌গা থেকে যখন একটাই স্টেশন আগ্রা তখন চিন্তার কোনও কারণ নেই—তোমাকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আমরা আগ্রা যাব।

মহিলা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তার নাম জিজ্ঞেস করায় বলল, সবিতা দত্ত, বালিগঞ্জের বাসিন্দা! বললাম, কুচ পরোয়া নেই। ভিতর থেকে 'লক' কর, নিশ্চিন্তে ঘুমোও বাচ্চাকে নিয়ে। চেকিং হয়ে গেছে আর এখন আসবে না। আমি ঠিক এই কামরার সংলগ্ন থ্রি-টায়ারে আছি, কেউ দরজায় টোকা দিলে বলবে, ওখানে আমার দাদা আছেন। তাঁকে ডাকুন, তারপর 'লক' খুলব।

না, কেউ আর তাকে বিরক্ত করতে আসেনি। আমি মাঝে মাঝে মার্শালের কাছাকাছি গিয়ে লম্বা কামরাটায় পায়চারি করেছি এবং লেডিস কম্পার্টমেন্টের ধারে দাঁড়িয়ে পল্টু ও আমি গল্প-গুজব করেছি। যতদূর মনে পড়ছে সকাল সাতটার মধ্যেই 'ইদ্‌গা' স্টেশনে এসে গেলাম। তার আগে সবিতা উঠে আমাদের ডেকেছে। তার বড় বড় দু-দুটো লেদার ব্যাগ ছিল, পল্টুকে বললাম ধরাধরি করে ওগুলো দরজার পাশে

রেখে আমি দাঁড়িয়ে থাকব তুমি ছোটখাট ব্যাগগুলো বয়ে আন। সবিতাকে বললাম, বাচ্চাকে নিয়ে অতি সাবধানে এস আমার সঙ্গে। স্টেশনটা যখন এল, তখন দেখি কোনও প্লাটফর্ম নেই। হাফ স্টেশন বা হল্ট স্টেশন যাকে বলি। তাছাড়া ওখানে কোনও কুলিও পাওয়া যায় না, ছোট্ট ষ্টেশন। সবিতার স্বামী টেলিগ্রাম পেল কিনা, তিনি সময়ে পৌঁছবেন কিনা ভাবতে ভাবতে দেহে ও মনে খুব শক্তি সংগ্রহ করে সবিতাকে বললাম, আমি নিচে দাঁড়িয়ে তোমার বাচ্চাকে নামিয়ে নেব, তুমি ধীরে ধীরে নিচে নেমে বাচ্চাকে তাড়াতাড়ি ধরে নেবে —ইতিমধ্যে পল্টু বড় ব্যাগ দুটো একটার পর একটা আমরা মাথায় দেবে আমি একে একে নিচে নামিয়ে নেব—তারপর ছোট ব্যাগ— ইতিমধ্যে সবিতা যেন তার স্বামী আসছেন কিনা লক্ষ্য করে, তা নইলে আমাদেরও ট্রেনটা ছেড়ে দিতে হবে সবিতাকে বাড়িতে পৌঁছে দেবার জন্যে। সে দিকে খেয়াল রেখে আমরা আমাদের হ্যাণ্ড ব্যাগ কাছেই রেখেছিলাম।

বোধহয় এক মিনিট ষ্টপ। পরের ষ্টেশন আগ্রা। সকলেই যথারীতি নেমে পড়েছি নির্বিঘ্নে। বাবু থেকে কুলি হয়েছিলাম ঐ একদিন। কারণ বড় বড় লেদার ব্যাগগুলো মাথায় চাপিয়ে টলতে টলতে স্টেশনে নামিয়েছিলাম। ঐ দিনের কুলি হওয়ার আনন্দ জীবনে ভুলতে পারি নাই। পারব না। খুব আনন্দ পেয়েছি, মনে পড়লে গর্বে বুক ফুলে ওঠে।

ট্রেন ছাড়ে ছাড়ে হঠাৎ সবিতা বলল, ঐ যে বেবির বাবা আসছে। কথা বলার অবকাশ কারো নেই—সবিতা তার স্বামী কাছাকাছি আসতেই জানিয়ে দিল ঐ দাদারা না থাকলে নামতে পারতাম না ওরাই আমাকে আজমীঢ় থেকে নিয়ে আসছে। ভদ্রলোক দুহাত নেড়ে বলল, নামুন। জোড়হাত করছি। আগ্রা নিকটে। আমি আমার গাড়ি করে পৌঁছে দেব। ট্রেনে উঠে পড়ে দরজার হ্যাণ্ডেল ধরে বললাম, আগ্রার মহারাজ হোটেলে থাকব, বুক করা আছে। ওখানে আসুন।

ঠিক ঘণ্টা দুয়েক পরে ভদ্রলোক এলেন এবং আমাদের নিয়ে যাবার

জন্য ঝুনোঝুনি। কথা দিলাম, আজ ক্লান্ত, কাল আগ্রা ঘুরব, পরশু আপনার ওখানে যাব, ওখান থেকে আবার আগ্রায় রেখে যাবেন। ভদ্রলোকের নাম অনিরুদ্ধ দত্ত।

ঠিক তাই করলেন ভদ্রলোক। ওদের ওখানে গিয়ে যে আতিথেয়তা পেয়েছি পল্টু ও আমি যতদিন বেঁচে থাকব, ভুলব না। তার ছ' মাস পর আবার গিয়ে দেখা করেছি। প্রায়ই চিঠি আসে যখনই আগ্রা যাব, যেন ওদের ওখানে যাই। আত্মার আত্মীয়কে খুঁজে পেয়েছেন ওঁরা। আমরাও তাই, প্রবাসী বাঙালি—তোমাকে নমস্কার।

দ্বিতীয় কাহিনীর উৎস আগ্রাতেই। আগ্রার মহারাজ হোটেলের মালিক একটা টাঙা (ঘোড়ায় টানা গাড়ি) ভাড়া করে দিয়েছিলেন সারাদিনের জন্যে রিজার্ভ করে। টাঙাটা রিজার্ভ ভাড়ার জন্যেই হোটেলের প্রবেশ পথে অপেক্ষা করে থাকে। আমরা তাকে নিয়ে অনেক জায়গায় ঘুরলাম। সেদিনের ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে পরের দিনও রিজার্ভ করলাম। চলতে চলতে আমার খেয়াল হল—কোচম্যান ঠিক কৃষ্ণনগরের মফিজের মতই দেখতে। শুধু মফিজের দাড়ি ছিল না। এ লোকটার কাঁচা-পাকা দাড়িতে চারিদিক ছেয়ে গেছে। সঙ্গী বন্ধু পল্টুকে বললাম, অনেক সময় মানুষের মুখাবয়ব প্রায় কাছাকাছি এসে পড়ে। এই ধরনের আর একটা কোচম্যান ছিল আমাদের কৃষ্ণনগর সিটিতে। তার অবশ্য দাড়ি ছিল না। নাম ছিল মফিজুদ্দিন। ডাকনাম মফিজ। আমরা দুজনে বাংলায় কথা বলছি। কোচম্যান কিন্তু উর্দুতে যা বলার বলছে। হঠাৎ আমি জিজ্ঞেস করলাম, ক্যোচম্যান তোমহারা নাম কিয়া হ্যায়। একটু ইতস্ততঃ করে বলল, জি, হুজুর,—মেরা নাম মফিজুদ্দিন আহমেদ।

কোন্ মুলুককা রহেনেওয়ালা?

একটু দেরি করে বলল, গয়া জিলাকা, বিহারকা রহেনেওয়ালা সাব।

ওর গলার স্বর শুনে আমার সন্দেহ জাগল—বললাম—উস্‌কে পহেলে?

মগরেবি বাঙ্গালমে নদীয়া জিলাকা।

আর যায় কোথা? গাড়ি থামিয়ে তাকে বললাম তুমি কি কৃষ্ণনগরের লোক?

অবাক বিস্ময়ে ধরাছোঁয়ার বাইরে থেকে নিজেকে এড়িয়ে চলার বৃথা চেষ্টা করল মফিজ। আমি ফ্যাল ফ্যাল করে তার দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে রইলাম। তার গোঁফ দাড়িটা বাদ দিয়ে পূর্বেকার মফিজকে আবিষ্কার করতে চেষ্টা করছি—বুঝতে পেরে সে আত্মসমর্পণ করল। পরিষ্কার বাংলা ভাষায় বলল, আপনি ধরে ফেলেছেন আমাকে, বুঝতে পেরে ধরা দিলাম। রফিজের ভাই মফিজ। আপনাকে দেখে গতকালই বুঝেছি কিন্তু আমি অপরাধী—কি করি বলুন। মনে পড়ে জলঙ্গীতে নৌকা ডুবি হওয়ার দিন আপনি ও আপনার স্ত্রী সিক্ত বস্ত্রে আমার দাদার গাড়িতে ওঠেন এবং আমাদের কৃষ্ণনগরের বাসায় এসে ভিজে কাপড় পাল্টান। তারপর দাদাকে ঠিকানা দিয়ে যান। দাদা আপনার কাছ থেকে টাকা এনে চাষ বাস করত আপনি আর্থিক সাহায্য করতেন। আমি ঘোড়া গাড়িই চালাতাম। সাপে কাটার ফলে দাদার মৃত্যু ঘটায় বৌদি জমিজমার অংশ বেচেকিনে বাপের বাড়ি চলে যায়। আমি আমার শ্যালকের পরামর্শে ওখানকার সবকিছু বিক্রি করে শ্যালকের সঙ্গে এখানে এসে কোচম্যানের কাজ করছি। এখানকার আয় প্রচুর। বহু পর্যটক আসে। ঘোড়াগাড়ি চালিয়ে আমার আয় হয় খুবই। দাদার সঙ্গে দু একবার আপনার বাড়িও গেছি টাকা আনতে, তাই প্রথম দর্শনেই আপনাকে চিনতে পেরেছি—। আপনি আমাকে চিনতে পারবেন না এটাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল—কিন্তু ধরা পড়ে গেলাম, এখন আপনাদের ছাড়তে ইচ্ছে করছে না। গরিবের ডেরায় পদধূলি দিলে ধন্য হব।

আমি বললাম, শর্ত হল আমি দু'চার দিন আগ্রায় থাকতে পারি—এর পরেও আসতে পারি কিন্তু তোমার গাড়ি রিজার্ভ করার দরুন যদি মানবতার খাতিরে পয়সা কম নেবার মনস্থ কর তাহলে আমি তোমার

গাড়ি ছেড়ে দেব। পরিচিতির সুযোগ নিয়ে কোনও লোককে আর্থিক বঞ্চিত করতে চাই না—আমার মন কোন রকমেই সায় দেবে না।

আপনাকে বিলক্ষণ চিনি--যদিও মাত্র দু'চারদিন আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটেছে। কোন বড়লোক তমস্সুকের কাগজে টিকিটের ওপর সই না করিয়ে টাকা ধার দিত না। কিন্তু আপনার বেলায় ও সবের বালাই ছিল না---ধার শোধ হোক না হোক। এটা নিয়ে আমার স্ত্রীর সঙ্গে কত আলোচনা করেছি, সে বিশ্বাসই করতে চায় না। আজ আপনাকে দেখতে পেলে সে ধন্য হবে। সে আপনাকে কখনই দেখেনি।

পশ্চিমবঙ্গ ছেড়ে ওর চলে আসার কারণ ওর দাদার শ্যালক আলমের কাছ থেকে যতটা জেনেছিলাম তার কিছু কিছু অংশ মনে পড়ছে। মফিজ তো গোপন করবেই। সে অপরাধী—কিন্তু কথার প্যাঁচে পড়ে মফিজের স্ত্রী হয়ত সত্যি কথাই বলে ফেলবে—এই ধারণা নিয়ে পল্টুকে গা-টিপে ইশারায় জানিয়ে দিলাম ওর ডেরাতেই যাব। পল্টু চুপ করেই রইল। মফিজ তার বাড়ির গেটে গাড়ি থামিয়ে রেখে আমাদের ভিতরে নিয়ে গিয়ে একটা ঘরে বসাল। মোটামুটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। গাড়ি ঘোড়া নির্দিষ্ট স্থানে রেখে এসে বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বেশে আমাদের কাছে এসে বসল। কয়েক মিনিট পরই ভিতরে ঢুকে আমাদের জন্যে চা নাস্তা নিয়ে এল। বললাম, আমাদের কোন-কিছুতেই আপত্তি নেই, তবে তোমার স্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাই। মফিজ বলল ঠিক আছে সাব, মোলাকাত করবে আমার জেনানা। চা-পান সমাপ্ত হলে ছিমছাম বেশে এক বয়স্কা মহিলা এসে একটু দূরে দাঁড়াল, কপাল পর্যন্ত ঘোমটা টানা।

পল্টু শ্রোতা। আমি বললাম—আমরা তোমার মেহমান (অতিথি)। আমাকে চিনতে পার ?

—জি না।

সঙ্গে সঙ্গে মফিজের উত্তর—নৌকাডুবির পর দাদার গাড়িতে করে

যখন আমাদের বাড়িতে গিয়েছিলেন তখন ও বাপের বাড়িতে ছিল। আপনাকে দেখেনি।

আবার প্রশ্ন—তোমরা কৃষ্ণনগর ছেড়ে চলে এলে কেন?

উভয়েই নীরব।

—তোমাদের ছেলে মেয়ে আছে?

—দুটো বেটা ছিল, বড় হয়েছিল। গাড়ি চালাতে পারত। একজনের বয়স কুড়ি বছর একজনের বাইশ বছর। দুদিনের ফারাকে দুজনেই মরে যায় কলেরা রোগে। আমরা স্বামী স্ত্রীতে কোনরকমে বেঁচে যাই। আর ছেলে মেয়ে হয়নি।

তোমার দাদার ছেলেমেয়ে?

—না, ছেলেমেয়ে ছিল না। দাদা মরে যাওয়ার পরই বৌদি জমি-জমা বাড়ি বেচে দিয়ে বাপের বাড়ি চলে যায়।

—মিথ্যে কথা। সব গোপন করছ। তোমার দাদার শালা আলম এখনও আমার কাছে আসে। পাপ কখনও ঢাকা থাকে না। (এই সময় পল্টু ঘাড় কাত করে একবার আমার মুখের দিকটা ভাল করে দেখে নেয়)।

সাপে কাটার ফলে তোমার দাদার মৃত্যু হয় এটা সত্যি কথা। তোমার বৌদিকে তুমি দেখতে না, খেতে দিতে না। দাদার ছোট্ট মেয়েটাও খিদেয় চিঁ চিঁ করত। দেখে-শুনে তোমার বৌদির দাদা তাকে নিয়ে চলে যায়। তোমাকে তোমার দাদার জমিও চাষ করার দায়িত্ব দিয়ে যায়। কয়েক মাস পরে তোমার বৌদির মৃত্যুসংবাদ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তুমি তোমার নাবালিকা ভাইঝিকে ফাঁকি দিয়ে অপর লোককে দাদা সাজিয়ে দলিলে তার টিপ নিয়ে জমি-জমা ঘর-বাড়ি বিক্রি করে সরে পড়েছ—সত্যি কিনা বল। তুমি অপরাধী যদি না হতে তা হলে আমাকে চিনতে পেরেও তুমি নিজেকে আড়াল করার চেষ্টা করতে না। কিন্তু দিন দুনিয়ার মালিক যিনি তিনি সবই দেখছেন, তাঁর চোখ এড়িয়ে চলার শক্তি কারো আছে? দাদার মেয়েকে বঞ্চিত করতে গিয়ে তুমি যাদের বঞ্চনা করার চেষ্টা

করেছ—তারাই অর্থাৎ তোমার দুই ছেলে তোমাদের ছেড়ে চলে গেল এখন দুজনেই পাপে ডুবে থাক যতদিন না মৃত্যু এসে তোমাদের উদ্ধার করে। এর পরেও কত না শাস্তি আছে ভেবে দেখেছ কি?

হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলল 'মফিজ'। তার স্ত্রী যেখানে দাঁড়িয়েছিল, সেখানেই বসে পড়ল মুখ ঢাকা দিয়ে, কারও নড়ার ক্ষমতা নেই। প্রকাশ হয়ে পড়েছে ওদের জোচ্চুরি।

মফিজকে মনে করিয়ে দিলুম দাদার মুখটা মনে পড়ে? শুধু ছেলেদের জন্যে কাঁদলে চলবে? দাদাটা কেউ নয়, যে দাদা মা-বাপ-হারা তোমাকে বুক দিয়ে রক্ষা করেছিল—আজ তার সন্তানকে তুমি ফাঁকি দিচ্ছ? শাস্তি তোমার হচ্ছে কি এমনিই। এর পরেও কত বাকি।

দেশের বাড়ির চিত্রটা মনে পড়ায় অথবা আমার কথাগুলো শুনে দুজনে কেঁদেই চলেছে। পন্টু আর কিছু না বলার জন্যে আমাকে ইশারা করায় আমি সমাধান সূত্র বের করে মফিজকে বললাম কেঁদ না, এর ব্যবস্থা আমিই করব—যদি আমার মতে মত দাও।

তোমার দাদার মেয়ে বি. এ. পড়ছে। ১৯/২০ বছরের মেয়ে। পড়াশুনায় ভাল। মেয়ের মামা আলম আমাদের গ্রামে ওদের এক আত্মীয় থাকে—তার কাছে এলেই আমার সঙ্গে দেখা করে যায়। যতদূর মনে পড়ছে মেয়েটার নাম স্বপ্না। তাকে দেখেছি ছোটবেলায়। আলম আমার কথা বলে। তার বাবাকে কীরকম সাহায্য করতাম—'তা-ও বলে, তার মুখেই শুনেছি। মেয়েটা আমার দেখা পেতে চায় কিন্তু আলম সাহস করে আনতে পারে না। তুমি যদি—দাদার মেয়েকে নিজের মেয়ে মনে করে গ্রহণ কর এবং যে মেয়েকে তুমি ফাঁকি দিতে চেয়েছিলে তাকে তোমার বলতে যা কিছু আছে প্রত্যর্পণ কর, তাহলে এই বৃদ্ধ বয়সে তোমরা শান্তিতে কাটাতে পারবে। কোনও কিছুর অভাব হবে না। আমি মধ্যস্থতা করলে ওরা মানতে বাধ্য। তোমাদের দুজনের ভরণপোষণের দায়িত্ব তারা নেবে। আলমের অবস্থা এখন খুবই ভাল হয়েছে। আমার মধ্যস্থতা সে মানবে—আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

প্রবাসী মফিজের হৃদয় কেঁদে উঠল স্বদেশের জন্যে। হাতজোড় করে সে এবং তার স্ত্রী উভয়েই বলতে লাগল—আমরা অন্যায় করেছি আপনি আমাদের ক্ষমা করুন এবং স্বপ্নাকে রাজি করান, আলমকে রাজি করান, আমাদের সবকিছু ওদের দিয়ে দেব, শুধু যতদিন আমরা দুজনে বাঁচব ওরা যেন আমাদের সারা জীবনের দায়িত্ব নেয়।

পল্টু বলল, খুব ভাল কথা। আমরা ব্যবস্থা করব। আমাদের পত্র পেলেই সপ্তাহ খানেকের জন্য তোমরা যাবে—তোমরা সাহেবের বাড়িতেই উঠবে। তারা যদি সাহেবের কথা না শোনে তোমরা ফিরে আসতে পারবে। সাহেব ব্যবস্থা করবেন চিন্তা নেই আমিও থাকব। তারা আশ্বস্ত হল। আসার সময় বললাম, চল হোটেলে পৌছে দেবে। কাল আবার গাড়ি নিয়ে যেও। মফিজের প্রাপ্য টাকা মিটিয়ে দিয়ে তার বাসার ঠিকানা নিয়ে দেশে ফিবলাম।

লোক মারফৎ আলমকে খবর পাঠালাম। সঙ্গে সঙ্গে সেদিনই আলম এসে গেল। আমার মুখেব কথা শুনে আলম একেবারে কাঠ হয়ে গেল। তাকে বুঝিয়ে বললাম মানুষই পাপ করে কিন্তু সেই মানুষকে প্রায়শ্চিত্ত করার সুযোগ যদি মানুষ না দেয় তাহলে তাদেরও অনুরূপ পাপে ডুবতে হয়। অসহায় লোককে সাহায্য করা মানবতার পরিচয়। পুত্রশোকে ওরা জর্জরিত। ওদের ক্ষমা করা মহতের পরিচয়।

আলম বলল, আপনার আদেশ অমান্য করার ক্ষমতা আমার নেই, তবে যদি আপনি হুকুম দেন তাহলে স্বপ্নাকে আপনার এখানে নিয়ে আসি। সে অনেকবার আপনাকে দেখতে চেয়েছে, আমি সাহস পাইনি।

বললাম, তুমি যেকোনও দিন আনতে পার। কোনও অসুবিধে নেই—আমার এখানেই তোমরা থাকবে। একদিন স্বপ্নার বাপও আমাকে আশ্রয় দিয়েছিল নৌকাডুবির ভয়াবহ আতঙ্কের মুহূর্তে। ভুলি নাই—ভুলব না।

স্বপ্না এল পরের রবিবারেই। সঙ্গে ওর মামা-মামী। খুব আনন্দ

পেলাম ওদের দেখে। আমাকে সালাম করার পর্ব শেষ হতেই আমি স্বপ্নাকে বললাম, তুমি তখন খুব ছোট্ট মেয়ে—তখন তোমার মা বেঁচে, সেই যা দেখেছি।

স্বপ্না লেখাপড়া শিখেছে, খুব মার্জিত, ছিমছাম পরিপাটি দেহ, এক গাল হেসে বলল, এতদিনে আমার ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটল, আপনার দেখা পেলাম—আমার আব্বাজান আপনার দ্বারা খুবই উপকৃত—মামার মুখে সব শুনেছি, আজ যেন আমি দেবদর্শন করছি।

পাশের চেয়ারে ওকে বসালাম, আদর করে বললাম, শুনেছি তুমি খুব মিষ্টি মেয়ে।—আজ চোখেও দেখছি তাই, চল বাড়ির ভিতরে। স্বপ্নাকে ও স্বপ্নার মামীকে স্ত্রীর কাছে পৌঁছে দিয়ে আলমের সঙ্গে নানা কথা সেরে নিলাম। স্ত্রীকে সব কথা জানিয়ে বলেছি। স্বপ্নাকে হাসিখুশির মধ্যে সব কিছু বুঝিয়ে বলার পর আপ্রাণ চেষ্টা করবে যাতে করে ওর চাচা-চাচীকে ক্ষমা করে তাদের আপনজন হিসেবে গ্রহণ করে। তারা পুত্রশোকে জর্জরিত। এখন স্বপ্নাই তাদের সবের ধন নীলমণি।

ঘণ্টাখানেক পরে বাড়ির ভিতরে পৌঁছতেই কোত্থেকে স্বপ্না দৌড়ে এসে আমার পায়ের নিচে বসে পড়ল। পা-দুটো জড়িয়ে ধরে ডুকরে কেঁদে উঠে বলল, "যে চাচা-চাচী আমাকে ফাঁকি দেবার জন্যে আমাদের সর্বস্বান্ত করে গেছে, আমার বাপের মুখ রাখেনি, সে চাচা-চাচীর মুখ যেন আমাকে দেখতে না হয়। তার কান্না দেখে চোখের জল আটকে রাখা ছিল অসম্ভব। আমি স্বপ্নার হাতদুটো ধরে দাঁড় করালাম—তারপর বললাম, স্বপ্না, তুমি আমার আপনজন, আজ তোমার বাপ-মা বেঁচে থাকলে আমার কথার অবাধ্য হতে পারত না। এ কথা শুনে সে আবার পায়ের কাছে বসে পড়ে মৃত বাপ-মার উল্লেখ করে বুকফাটা আর্তনাদ করে উঠল—তোমাদের দিদা এসে তখন স্বপ্নার হাত ধরে উঠিয়ে বুকের কাছে টেনে নিল। সে কী কান্না—ঐ দেখ, সেদিনের কথা মনে করে ওর তো চোখ ছলছল করছে।

স্বপ্নার মামী আমার সামনা-সামনি আসতে ইতস্তত করছিল। আমি

পরিচারিকাকে দিয়ে ডেকে পাঠাতে সে এসে স্বপ্নাকে ঘরের ভিতর নিয়ে গেল।

শুনলাম সে তারিখে সারা রাতই সে কেঁদেছে। পরের দিন অনেকটা শান্ত। চা-পান সেরে আলম গেল ও-পাড়ায় আত্মীয়দের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করতে। সেই অবকাশে আলমের স্ত্রী, স্বপ্না, আমি ও তোমাদের দিদা বসে অনেক করে স্বপ্নাকে বোঝালাম এবং বললাম তোমার চাচার কি আছে জানি না তবে যাই থাক সবই তোমার। আর তুমি যে বাবা মাকে হারিয়েছ, সেই বাবা-মাকেই ফিরে পাচ্ছ। তারা অন্যায় করতে পারে। তোমার তো গুরুজন, এতটা লেখাপড়া লিখে মানবতার পরিচয় দেওয়াই বাঞ্ছনীয়। আমাদের কী স্বার্থ আছে বল—তোমাদের শান্তির জন্যই এ-সব করা। তুমি যদি তোমার বাপের মুখটা দেখতে চাও, তাহলে তোমার চাচার মুখটা দেখ। স্বপ্না আবার কেঁদে উঠল। আমি তার মাথায় হাত বুলিয়ে শান্ত করলাম, চোখ মুছতে মুছতে বলল, তাদের আনুন, আমি মেনে নেব, কোনও আঘাতই দেব না।

—সাবাস, এই-তো চাই। এই তো শিক্ষার মর্যাদা। তাদের চিঠি দিই তারপর তোমাদের ডেকে পাঠাব। এখানেই তারা আসবে। তবে আজকেও তোমাদের এখানে থাকতে হবে। আগামী কাল ছাড়ব। শান্ত ভাবে সবকথা মেনে নিল স্বপ্না।

মফিজকে চিঠি দেওয়ার দিন পনের পর সে তার স্ত্রীকে নিয়ে চলে এল আমার বাড়িতে। কিশোর বয়সে সে তার দাদার সঙ্গে দু' একবার এসেছিল, রাস্তাঘাট তার জানাই ছিল। ওদের আসার দিনই লোক পাঠালাম আলমের কাছে। আলম, তার স্ত্রী ও স্বপ্নাকে নিয়ে পরদিনই হাজির হল। বাড়ি ঢুকেই স্বপ্না কাঁদতে কাঁদতে আমাকে জড়িয়ে ধরল—তার মনের কথা হল, কি করে সে তার চাচার সঙ্গে আলাপ করবে। মফিজ ও তার স্ত্রী মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল। মফিজকেও কাঁদতে দেখলাম। আলম ও আলমের স্ত্রী দূরে দাঁড়িয়ে। আলমের স্ত্রী আলমের পিছনে। আমার থেকে একটু আড়ালে থাকতে চায়। লজ্জাশীলা বলে। আমি স্বপ্নার হাত ধরে তার চাচার কাছে টেনে নিয়ে গেলাম। বললাম,

দেখ, হাজার হোক বাপ-চাচা, গুরুজন ব্যক্তি, সালাম কর। স্বপ্না কোনরকম দ্বিধা না করে ওর চাচার পা-দুটো জড়িয়ে ধরে অঝোর নয়নে কাঁদতে লাগল। ওর চাচীমা ওকে টেনে তুলে নিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরল, তার গণ্ডবেয়ে তখন অবিরাম অশ্রুধারা। মফিজ হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল। সে এক দৃশ্য। ভোলার নয়, আমি এখনও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। কয়েক মিনিট পরে আমি স্বপ্নার হাত ধরে উঠিয়ে নিয়ে গেলাম পাশের ঘরে, সেখানে অপেক্ষায় ছিল তোমাদের দিদা। স্বপ্নার চাচী ও মামীকেও ডাকলাম। ওরাও পিছন পিছন গেল। মহিলা মহলকে সুযোগ দিয়ে আমরা বৈঠকখানায় বৈঠক করলাম। শান্তি ফিরে এল।

পরদিন স্বপ্নার জিদের ফলে আমাকে ওদের সঙ্গী হতে হল। আলমের আতিথেয়তায় আমি মুগ্ধ। সেখানে সকলকে নিয়ে বেশ বৈঠক করলাম। মফিজকে বললাম আগ্রার ঘর-বাড়ি বিক্রি করে গুটিয়ে এখানে চলে আসতে হবে। আলমের ওপর আদেশজারি করলাম, মফিজকে বসবাসের জায়গা দিতে হবে। আলম বলল, জায়গা শুধু নয়, থাকার ঘরও করে দেব। ওবা বৃদ্ধ হয়েছে। যতদিন বাঁচে এখানেই থাক। আলমের আথিক অবস্থা ভাল।

শেষমেশ মফিজের বার বার অনুরোধে ঠিক হল স্বপ্না, আলম ও আলমের স্ত্রী ওদের সঙ্গে আগ্রা যাবে। আমি বললাম, তা মন্দ নয়, তোমরা মফিজের ওখান থেকে বেড়িয়ে এস। তারপর ও ক্রমে ক্রমে সেখানকার ঘর বাড়ি বিক্রি করে চলে আসবে। সকলে রাজি হল।

আলম আগ্রা থেকে ঘুরে এসে আমার সঙ্গে দেখা করে বলল, মফিজের বাড়ির দাম হয়েছে পঞ্চাশ হাজার টাকা। আপনি তাদের বাকি জীবনটার সম্বন্ধে মধ্যস্থতা করে দিলে সব টাকাই দেবে স্বপ্নাকে।

বললাম, উত্তম প্রস্তাব। তাদের ঘর বাড়ি বিক্রি করে চলে আসতে বল। স্বপ্নাকে নিয়ে আবার বেড়াতে এস। খুব খুশি হল আলম। পরদিন চলে গেল। মাঝে মাঝে মফিজ, স্বপ্না আলম আসত। স্বপ্নার বিয়েতে আমাকে যেতে হয়েছিল। ওরা সকলে আজও আছে। সুখেই আছে।

এ সময় আমার স্ত্রী বলল, ফুলবানুর শেষ পরিণতি এরকমই কতকটা। ওর ঘটনা এদের বল। আমারও আর একবার শোনার ইচ্ছে হচ্ছে।

ইতিমধ্যে আর একবার চা-পান সেরে নেওয়া গেল।

সকলেই শোনার জন্যে আগ্রহী দেখে আরম্ভ করলাম। ফুলবানু একটা ছুতোর মিস্ত্রির মেয়ে। বাড়ি মেদিনীপুরের ঘাটাল এলাকায়। ন' বছর বয়সে বিয়ে হয় পাড়ার বারো বছরের কিশোরের সঙ্গে। ছেলেটি ছিল লেখাপড়ায় ভাল। মেয়ের বাবার সঙ্গে ছেলের বাবার বন্ধুত্ব ছিল। ছেলের বাবা কোলকাতায় একটা বড় বেকারিতে পাউরুটি তৈরি করত।

ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভাল ফল করে উত্তীর্ণ হওয়ার পর এক হৃদয়বান ব্যক্তির সাহায্যে সে পড়ার সুযোগ করে কোলকাতায়। ন' বছরের বৌ দেশেই থাকে। ডাকনাম ফুলবানু। ছেলেটার নাম নঈমুদ্দিন। কখনও সখনও দেশের বাড়ি গেলেও শ্বশুর বাড়ি যেত না—কারণ বিয়েতে তার মত ছিল না কোনরকমে একবেলা কাটিয়ে পরের দিন পালিয়ে আসত কোলকাতা।

ঠিক কুড়ি বছর বয়সে সে বি. এ. পাস করে। তারপর আইন বিভাগে ভর্তি হয়। ওকালতি পাস করার পর আইন ব্যবসা আরম্ভ করে। সে সময় তার বাপ-শ্বশুর-শাশুড়ি সকলেই মারা গেছে। ফুলবানু থাকে তার চাচা-চাচীর কাছে। চাচার ছেলেমেয়ে ছিল না। চাচা রং পালিশের কাজ করত।

ফুলবানুর বয়স যখন বাইশ-তেইশ তখন পাড়ার লোকেরা ফুলবানুর চাচাকে চাপ দিতে থাকে যদি নঈম ওকে না নিতে চায় তাহলে বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটিয়ে পুনরায় মেয়ের বিয়ে দাও। ফুলবানুর চাচারও তাই মত। কিন্তু মেয়ে কিছুতেই রাজি হয় না। তার বক্তব্য, আমি ছোট ছিলাম বলে আমার মত না নিয়ে তোমরা যখন বিয়ে দিয়েছ, আর সে যখন আইন পাস করেছে তখন তার শেষ বিচার পর্যন্ত আমি অপেক্ষা করব। পৃথিবীতে আমি যেন নেই। সে এমন জিদ ধরল যে কেউ তাকে

দ্বিতীয় বিবাহে রাজি করাতে পারল না। এই ভাবেই চলে। সে খেজুর পাতা থেকে একরকম চাটাই তৈরি করত। বাড়ি থেকেই বিক্রি হয়ে যেত। তাতে তার মত খরচ-খরচা উঠে আসত। কখনও বা পরের কাছ থেকে অর্ডার পেয়ে তাদের দেওয়া কাপড়-চোপড় থেকে কাঁথা তৈরি করে দিত—তাতে মজুরি ভালই পেত।

কিছুদিন পর চাচা চাচীও পৃথিবী ত্যাগ করল। প্রতিবেশী তুই বিধবাকে নিয়ে কাঁথা শিল্পের ও চাটাই বোনার কাজ করে জীবন কাটাত। ঐ তুই বুড়িকে নিজের কাছে রেখেই কাঁথার ব্যবসা করত।

নঈমের বয়স যখন ত্রিশ—তখন সে ওকালতিতে পসার করেছে, মক্কেলদের কাছে সুনামও পাচ্ছে, ফলে যে ভদ্রলোকের সহায়তায় নঈম লেখাপড়া শিখেছিল, তার মেয়েটি ওকালতি পাস করায় নঈমের জুনিয়র হিসেবে নিযুক্ত হয়। মেয়েটির নাম সেরিনা। বছরখানেকের মধ্যে নঈম ও সেরিনাকে ছাদনাতলার আইনে আবদ্ধ হতে হয়। নঈম দেশের বাড়িতে যাওয়া বন্ধ করে। তু বছর পরে সেরিনার গর্ভে একটি পুত্র সন্তান হয়। ছেলেটির নাম আখতার। সে-ও পরে ওকালতি পাস করে। ৫২ বছর বয়সে সেরিনা হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। আখতার মেদিনীপুরের কোন মক্কেলের মুখে জানতে পারে তার বাপের প্রথম স্ত্রী তখনও জীবিত, বয়স ৫৭। শুনে তার মন খারাপ হয়। সে তার বাপের কাছে বিস্তারিত তথ্য জানতে চায়। নঈম ছেলের কাছে কোনও কিছুই গোপন করেনি। নিজের অপরাধ অকপটে স্বীকার করেছিল। আখতার তখনও বিয়ে করেনি। সে বাপকে বুঝিয়ে বলে, তুমি যে অন্যায় করেছ তার প্রতি-কারের দায়িত্ব আমার ওপর বর্তেছে। আমি আমার সেই মাকে আনতে চাই, যদি রাজি না হও, তুমি বেঁচে থাকতে আমি বিয়ে করব না। আমাকে লোকচক্ষে হেয় হতে হবে। আপন মা বা সৎমা যাইহোক সংসারে থাকলে সকলকে মানিয়ে নিয়ে চলা যাবে সেখানেই শান্তি। না হলে আমারও বিয়ে করার কোনও দরকার নেই এ ভাবেই চলুক।

বাধ্য হয়েই নঈম সাহেবকে ঘাড় পাততে হল—শুধু তাই নয়, ছেলেকে নিয়ে দেশের বাড়ি যেতে হল।

তাদের উপস্থিতিতে গ্রামে খুব হৈ চৈ। অনেক বাক-বিতণ্ডা পরিণতিতে গাড়িও ভাঙচুর করার মত অবস্থা। কতকগুলো বৃদ্ধ ব্যক্তির অনুরোধে গাড়ি অক্ষত থেকে যায়।

নঈমের হাত ধরে টানা-হেঁচড়াও করেছিল স্থানীয় ক্লাবের ছেলেরা। আখতারের হাত জোড় ও কাতর প্রার্থনায় সকলে অবশ্য শান্ত হল। আখতার সুবক্তা। সে জোর গলায় বলেছিল—বাপ অন্যায় করেছে বলেই তো বাপকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি ক্ষমা চাওয়ার জন্যে। আর আমি যেমন আমার বাপকেও ছাড়তে পারি না, তেমনি ছাড়তে পারি না আমার মাকেও। আল্লার নামে শপথ করে বলছি মাত্র তিন দিন আগে জানতে পেরেছি আমার একজন সৎমা আছে। সৎমাকে না নিয়ে আমি যাচ্ছি না। তার কথা শুনে সকলেই শান্ত হল।

কেউ কেউ বলল, সারাজীবন দুঃখে গেল—খোরপোশ দেয়নি কোনদিন, খোঁজ খবরও নেয়নি, সুতরাং শরিয়ত অনুযায়ী আপনা থেকেই বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে গেছে। অতএব আর ওর আওতায় যাওয়া সমীচীন নয়। কেউ কেউ বলল, কোন পক্ষই তো বিচ্ছেদের প্রশ্ন তোলেনি, কোন আর্জিও পেশ করেনি। সুতরাং মহিলা ইচ্ছা করলে স্বামীর সঙ্গে যেতে পারে। তাছাড়া বৃদ্ধ বয়সে অসুস্থ হয়ে দীর্ঘদিন শয্যাগত থাকলে কে দায়িত্ব নেবে। এ সব বিষয় বিবেচনা করে প্রতিবেশীরা স্বামীর সঙ্গে যাওয়ার অনুমতি দিল। আখতার তার সৎমার হাতে পায়ে ধরে গাড়িতে তুলে নিল। প্রতিবেশী মহিলারা চোখের জল মুছতে মুছতে ফুলবানুকে বিদায় দিল। কেউ কেউ কথা দিল আখতার এসে নিয়ে গেলে কোলকাতায় গিয়ে তারা ফুলবানুকে দেখে আসবে। আখতারও কথা দিল দু' এক মাস পর সে গ্রামের বাড়িতে আসবে, কেউ তার সৎমাকে দেখতে চাইলে তাকে সঙ্গে করে কোলকাতা নিয়ে যাবে। লোকেরা আখতারের কথায় খুশিই হল।

ফুলবানু কোলকাতা এলে আমি আলাপ করলাম—আশ্বস্ত করলাম। বলা-বাহুল্য আখতার আমার অপেক্ষা বয়সে অনেক ছোট তথাপি তার সঙ্গে বন্ধুত্ব প্রগাঢ়। আমার মামলা মোকদ্দমা দেখাশুনা

সেই-ই করে। আমার পরামর্শ ক্রমেই সে তার সৎমাকে আনার জন্য তার বাপকে রাজি হতে বাধ্য করে এবং সৎমাকে কোলকাতা নিয়ে এলে বাপ-মার শেষ জীবনটা সুখে শান্তিতে যাতে কাটে তার ব্যবস্থা করে। আমার পরামর্শ কাজে লাগায় আমি খুবই খুশি। আজও মাঝে মাঝে যাই ফুলবানুর সঙ্গে বসে গল্প করতে।

আরও একটা শান্তির কাহিনী শুনিয়ে আজকের মত অধিবেশন সমাপ্ত হবে। আগামীকাল তোমাদের দিদার ও আমার অগ্নিপরীক্ষার কাহিনী শুনিয়ে এবারকার মত মানচিত্রের শেষ তুলির টান দেব। পরবর্তীতে নতুন কলেবরে মানচিত্র আঁকা হবে – যদি সে সুযোগ ঘটে।

আমার এক সহপাঠী শ্যামাপদ। বাড়ি কালনা। কোলকাতায় কলেজে একসঙ্গেই পড়েছি। খিদিরপুরের মনসাতলার এক দালালের প্রলোভনে পড়ে সে দমদমে বিয়ে করে। বিয়ের পূর্বে সে ছিল বেকার। বাবার একমাত্র মেয়ে দেখে বিয়ে করে। উদ্দেশ্য শ্বশুর মশায়ের ব্যবসার ভাবী উত্তরাধিকারিণী হবে তার স্ত্রী, সন্তানাদি হলে চিন্তার কারণ থাকবে না। এই আশাতে সে অলস জীবনযাপন করতে লাগল। তার বিয়ের বছরখানেক বাদে তার এক শ্যালক জন্মগ্রহণ করে। তখন শ্বশুর শাশুড়ির চিন্তা অন্যদিকে মোড় নেয়। শ্যামাপদ তখনও যদি চাকরি বাকরির চেষ্টা করত তাহলে ভাগ্যে বিড়ম্বনা ঘটত না। কিন্তু নির্বিকার-চিত্ত শ্যামাপদ বৌয়ের আঁচল ধরেই দিন কাটাত। ধূমপানের নেশা ছিল খুবই। দিনে দু-প্যাকেট সিগারেট কমপক্ষে তার খরচ হত। প্রথম প্রথম বৌ টাকা দিত সিগারেটের। বছর দুই পর বৌ মেজাজ দেখাতে লাগল, তার সিগারেটের খরচা ও হাত খরচা দিতে বিরক্ত হত। শ্যামাপদ বসে থেকে থেকে এমনই অলস হয়ে পড়েছিল যে, প্রাইভেট টিউশানি করতেও তার মন চাইত না। শ্বশুরের ব্যাঙ্ক ব্যালান্স ও চলতি ব্যবসার প্রতিই তার লক্ষ্য ছিল। এখানেই সে ভুল করল। বিশেষ করে শ্যালকের জন্মগ্রহণের পর তার 'হুঁশিয়ার হওয়া উচিত ছিল। চাকরির চেষ্টা করাও উচিত ছিল। কেউ বললে সে বিরক্ত হত। অথচ দিন গেলে তার হাত খরচ লাগত অনেক। বৌ কত আর সহ্য করে। মা-বাপকে

সব কথা গোপন করে রাখতো নিজের মুখ রাখতে—কারণ তারও তখন একটা সন্তান হয়েছে। এ ভাবে পাঁচবছর কাটল।

শ্বশুর মশায়ও তার প্রতি অবিচার করেছিলেন। বিয়ের সময় তাকে ব্যবসা করে দেবেন বলে কথা দিয়েছিলেন। শর্ত ছিল তাকে ঘর-জামাইয়ে থাকতে হবে। কারণ তার তখন কোন পুত্র সন্তান ছিল না। পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করার পর শ্যামাপদকে ঘরে জামাইয়ে রাখতে তাঁর ইচ্ছা ছিলনা। মেয়ে কান্নাকাটি করবে বলে প্রকাশ্যেও কিছু বলতে পারত না। শ্যামাপদ ঘর জামাইয়ে থাকার দরুন তার ভাইয়েরাও ক্ষুব্ধ। কালনাতে আসার কথা কোনদিন তাকে বলতো না। শ্বশুরের পয়সায় বড়লোক হওয়ার নেশায় সে ভাইদের তেমন আমল দিত না। তারাও শ্যামাপদর সঙ্গে সব সম্পর্ক ছেদ করেছিল।

ছেলের জন্য এটা ওটা কেনার তাগিদে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রায়ই ঝগড়া হত, বেকার স্বামীকে সহ্য করতে পারত না মিতালী। মাঝে মাঝে আমার কাছে এসেও টাকা ধার নিয়ে যেত। আগের টাকা শোধ না করেই আবার টাকার জন্যে ঝুনোঝুনি করত। অনেকদিনের আলাপ। বিরক্ত হলেও টাকা দিতে হত।

একদিন শুনলাম স্বামী-স্ত্রীতে ঝগড়া করে সে কোথায় চলে গেছে। মিসিং স্কোয়াডের সাহায্য নিয়েও তার কোন পাত্তা মেলেনি। শুনে মনটা খারাপ হল। আমি কোনদিন তার স্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাইনি—তার স্ত্রীর বা শ্বশুরের ব্যবহার আদৌ ভাল ছিল না জানতে পারার পর আর মন বলেনি ওর স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করি।

চার-পাঁচ বছর পর আমি হাওড়ার এক বন্ধুর সঙ্গে গেছি আজমীঢ়ে। তার অনুরোধে তারাগড় পাহাড়ে পৃথ্বীরাজের কেল্লা দেখতে গেলাম। পাহাড়ের উপরিভাগে পাথর খোদাই করে পৃথ্বীরাজের সৈন্যদের থাকার ব্যবস্থা দেখে মুগ্ধ হলাম। অনেক দোকান পসারও সেখানে। লোক সমাগমও প্রচুর। একটা দোকানে চা খেতে ঢুকছি, হঠাৎ বেঞ্চে বসে-থাকা একটা দাড়িওলা লোক দ্রুত চায়ের কাপ ফেলে সরে পড়ার চেষ্টা করছিল। দোকানদারের টি-বয়টা দ্রুত গিয়ে তার জামা ধরে

টেনে আনার চেষ্টা করছিল। সে-ও জোর করে জামাটা ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছিল। দেখতে দেখতে আরও ছু-চারজন জড়ো হল। সকলে হৈ-চৈ করে উঠল—চা খেয়ে পয়সা না দিয়ে লোকটা চলে যাচ্ছে। লোকটা আমাদের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা করছে, বলছে—ভাইয়্যা সোচ্‌না মাৎ. হাম জরুর পয়সা দেঙ্গে, মাগার হামারা মানিব্যাগ ফেককে আয়া। মানিব্যাগ লানে কো হাম যাতা হ্যায়, আভি হাম আয়েঙ্গে।

'বাঙ্গালকা', 'বাঙ্গালকা' ছুটো শব্দ কানে এল। কৌতূহলবশত বন্ধুর হাতে বাক্সটা দিয়ে উঁকি মেরে লোকটাকে দেখতে পেলাম। দাড়ি রাখলে কি হবে অনায়াসেই শ্যামাপদ আমার চোখে ধরা পড়ল। আমি তার হাতটা ধবে বললাম, আমাকে দেখেই তুমি পালাবার চেষ্টা করছিলে এখন বুঝতে পারছি। কিন্তু কেন ? তোমার সব খবর পেয়েছি, হাতটা ধবে টেনে এনে দোকানে বসালাম। কত খেয়েছ ? দোকানদার বলল, এক রূপায়াকা খায়া হ্যায়। আমি বললাম, ঠিক হ্যায় হাম দেঙ্গে। শুনে লোকজন সবে পড়ল। তিন বন্ধু দস্তুর মত খেলাম। বাইরে বেরিয়ে এসে প্রথমে পাহাড় থেকে তরতর করে নামলাম। শেষের দিকে পরিষ্কার একটা টিলার ওপব তিন বন্ধুতে বসে ওর গা-ঢাকা দেওয়ার আজব কাহিনী শুনে মনে বড় আঘাত পেলাম। বললাম, শ্যামাপদ তুমি ঠিকই করেছ, আবার করোওনি। বাচ্চাটা তোমার। তার কথা ভেবেছ ? কোনও উপায় নেই বলেই সব কিছুকে বাধ্য হয়েই ভুলতে বসেছ। সাইকোলজি বুঝি। পৃথিবী মায়াময়, রহস্যঘন। স্বামীর কর্তব্য ঠিক পালন করতে পারনি। পরের অর্থের লোভে নিজের জীবনটা নষ্ট করলে এক দালালের প্রলোভনে পড়ে। স্ত্রীর দোষও ঠিক দেওয়া যায় না। বাবার হাজার থাক—স্বামীর পয়সাতেই তারা সন্তান পালনের গৌবর অনুভব করে, তাদেরও সমাজ আছে। সেখানেও তাদের বিরূপ সমালোচনা শুনতে হয়। লজ্জায় মাথা কাটা যায়, সেজন্যই তারা মরিয়া হয়ে দুর্ব্যবহার করে। এসব সকলের বোধশক্তিতে আসে না। তাতেই তোমার শ্যালক ভূমিষ্ঠ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বহুবার তোমাকে সতর্ক করে

দিয়েছি—নিজে রোজগার করার চেষ্টা কর, নতুবা জীবন হবে দুর্বিষহ, হয়েছেও তাই, কিন্তু ভাগ্য তোমার সুপ্রসন্ন। আমার সঙ্গে তোমার দেখা হওয়াটাই ভাগ্যের। আমি তোমার বন্ধু, কোনদিন গল্পচ্ছলে তোমার স্ত্রীকে বলেছিলে, আমার ঠিকানাও তাকে দিয়েছিলে। তুমি নিখোঁজ হওয়ার পর বহুবার তারা এসে আমাকে বিরক্ত করেছে, আমি ধরা-ছোঁয়া দিই-নি।—কোথায় পাব তোমাকে। মিসিং স্কোয়াডে জানিয়েও পাত্তা করতে পারেনি। তুমি কেন দাড়ি রেখেছ আমি বুঝেছি। তোমার জন্য তাদের গোকুল অন্ধকার। তোমার শ্বশুর মারা গেছে, শাশুড়ি, স্ত্রী আর তোমার শ্যালক ও তোমার বাচ্চা। ব্যবসা এখন তোমাকেই দেখতে হবে, উপস্থিত ব্যবসা বন্ধ। আমার কাছে এটাই শেষ খবর।

শ্যামাপদকে হাতছাড়া করলাম না। মানুষের মনের খবর জানা কঠিন। কখন আবার মনে পড়ে। সতর্ক পাহারায় দুই বন্ধুতে ওকে ফিরিয়ে এনে ঘাটালে ওর শ্বশুর বাড়িতে হাজির হলাম। ওকে দেখে মরা কান্না পড়ে গেল। পরে সকলে শান্ত হল। আমাদের সেদিন ছুটি হল না। ওর বৌ হাতজোড় করে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছিল। ওদের ৫-৬ বছরের বাচ্চাটাকে আমার কোলে বসিয়ে দিয়েছিল। চোখের জলে ঝাপসা দেখছিলাম কিন্তু অন্তরে খেলছিল আনন্দলহরী। শ্যামাপদকে আর ওর শাশুড়ি, বৌকে ভাল রকম বুঝিয়ে ফিরে এসেছিলাম। এখনও শ্যামাপদ কোলকাতা এলে আমার সঙ্গে দেখা করে। ওদের পুনর্মিলনের সুযোগ ঘটাতে পেরে খুব খুশি হয়েছিলাম।

খাওয়া-দাওয়ার প্রস্তুতি চলছে—স্ত্রীকে একাকী পেয়ে বললাম, হঠাৎ একটা কাহিনী মনে পড়ল কিন্তু ছেলেদের সামনে বা পাঁচিকে আশ-পাশে রেখে সে কাহিনী বলা যাবে না। এতদিন খেয়াল ছিল না, আজ রাত্রে শয্যাগ্রহণের পর কাহিনীটা তোমাকে শোনাব—তাহলেই তুমি বুঝবে 'মানুষের মানচিত্রে' ঐ চিত্রটাই মর্মস্পর্শী।

রাত্রে শোবার ঘরে ঢুকে কাহিনীটা শোনাতে আরম্ভ করলাম।

তারাপদ দাস আমাদের গ্রামেরই লোক। জাতিতে তন্তুবায়।

তসরের কাপড় বুনত। ওড়িশার বারিপদা থেকে আমদানী করত গুটিপোকা থেকে তৈরি তসরের সুতো। কাপড় বুনে বিক্রি করত। অবস্থা ভালই করেছিল। সুদর্শন যুবক, বলিষ্ঠ, কর্মঠ, হাস্যরসিক কিন্তু ছিল নপুংসক। সুতরাং তার বিয়ে করাটাই হয়েছিল বোকামি। চিকিৎসা করানোর পর, শারীরিক দিক থেকে উপযুক্ত হওয়ার পর তার বিয়ে করা উচিত ছিল। এ নিয়ে কারো সঙ্গে আলোচনাই করেনি। মা, বাবা, ভাই কেউ ছিল না। আগেই মারা গেছিল। শখ করে বিয়ে করে ফাঁপরে পড়ল। স্বাস্থ্যবতী সুন্দরী স্ত্রী। কয়েকমাস পরে অশান্তি দেখা দিল। বাপের বাড়ি চলে গিয়ে বছর খানেক আসেনি। পরে তারাপদ গিয়ে মিথ্যে প্রলোভন দিল, ডাক্তার দেখিয়ে তার রোগ সেরেছে। স্ত্রী কোনও প্রমাণই পেল না তবুও লজ্জার খাতিরে সেবারের মত আর একবার স্বামীর সঙ্গে এল। মাস দুয়েক পর স্বামী-স্ত্রীতে খুব অশান্তি বেড়ে গেল। প্রচুর গয়না গাঁটি। সব ছুঁড়ে ফেলে দিল তার স্ত্রী। অনেক সময় খাওয়া-দাওয়াও করত না, রাগ করে শুয়ে থাকত। বাপ-মা জোর করে পাঠিয়েছিল তাদের পাড়ার লোকের টিটকারী থেকে রেহাই পেতে। সেজন্যে বাপ-মার বাড়িও ছেড়ে দিল বৌটা। মনের দুঃখেই দিন কাটায়। ঐ পাড়ার প্রত্যেকেই ওদের ঝগড়ার ব্যাপ্যারটা জানতে পারে। সুযোগ সন্ধানী এক যুবক ওৎ পেতে থাকে—মেয়েটাকে নিয়ে কোথায়ও পালাবার চেষ্টা করে। মেয়েটা খুব সিরিয়াস টাইপের। কিন্তু কতদিন আর হাত দিয়ে জোয়ারের বাঁধ আটকে রাখতে পারে। ক্রমশ বরফ গলতে থাকে। মন থেকে পাপ মুছে যায়। পাপ বলে কোনও জিনিস হয় না। প্রয়োজনের তাগিদে সব কিছু পুণ্যি। তার মনটা এসব নানা রকম ভাবনা চিন্তার পর জল গড়াতে থাকে। জল মানে বুঝলে তো মনের গতিবেগ। যুবকটির ইশারায় সেদিন সাড়া দেয়। সুযোগের সন্ধানে থাকে উভয়ে।

তারাপদকে বারিপদা যেতেই হবে তসরের সুতো আনতে। পাড়ার এক বিধবা মহিলাকে রাত্রে স্ত্রীর কাছে শোবার জন্যে ব্যবস্থা করে যেত। এ বারেও করল।

ঘুম আসার সঙ্গে সঙ্গে বিধবা মহিলার নাক ডাকত, সেই সুযোগে সদর দরজা খুলে রেখে যুবকটিকে আহ্বান করার বাসনা জেগেছিল তারাপদর স্ত্রীর। যুবকটিও এসেছিল, বাড়িতে ঢুকেও ছিল কিন্তু বিধবা মহিলাটি ঘুমের ঘোরে পাশ ফিরতে গিয়ে—বৌটির নাম ধরে ডাকে, বিধবা মহিলার গলা শুনেই বৌটা কাঁপতে শুরু করে এবং হঠাৎ তার মুখ থেকে 'চোর চোর' শব্দ বেরিয়ে আসে।

তারাপদর স্ত্রীর চিৎকারে প্রতিবেশী কয়েকটি যুবক ছুটে আসে। তারা এক বন্ধুর ঘরে বসে তাস খেলছিল। চোরটাকে ধরার চেষ্টায় তার পিছু পিছু দৌড়ে ধরেও ফেলে। দেখা যায় পুকুরপাড়ের নিতাই। কিন্তু এত রাতে পুকুরের ওপার থেকে এখানে নিতাইয়ের কি দরকার! পাড়ার বুড়োরা হ্যারিকেন হাতে বাড়ির বাইরে আসে, যখন শুনতে পায় চোর ধরা পড়েছে। চোর কেউ নয়, পুকুরপাড়ের বিশ্বনাথের ভাই নিতাই। কিন্তু কীসের চোর? কী জন্যে এসেছে এদিকে। তারার বৌ—চেঁচালো কেন?

নানা প্রশ্ন।

বৃদ্ধরা বৌটাকে জিজ্ঞেস করল। কী হয়েছে? কেন তুমি চেঁচালে বল?

—আমি ঘুমিয়েছিলাম, মনে হল আমার স্বামী দরজা খুলতে বলছে। আমি উঠে গিয়ে দরজা খুলতেই লোকটি পালিয়ে যাবার চেষ্টা করছে দেখেই 'চোর' 'চোর' বলে হেঁকেছি। ঠিক সে সময় মাসিমাও বিছানা ছেড়ে আমার কাছে এসে দাঁড়াল। পাড়ার ছেলেরা ছুটে আসতে বুকে বল পেলাম। মাসিমাকে নিয়ে তাই দাঁড়িয়ে আছি চোরটাকে ছেলেরা ধরতে পারে কিনা দেখছি।

চোরটাকে ধরে রেখেছে ছেলেগুলো—বৃদ্ধরা জিজ্ঞেস করল নিতাইকে, কী ব্যাপার তোর মুখে শুনি! সে কাঁপতে কাঁপতে বলতে লাগল, বাবুদের বড় পুকুরে 'ঝুপি' দিয়েছি। সন্ধ্যের আগেই বড় ধরনের বোলমাছকে ঘোরাফেরা করতে দেখেছি। তাই 'ঝুপি' দেওয়ার পর ঘুম আসছে না, আসার কথা ভোরের দিকে কিন্তু লোভ সামাল

দিতে পারিনি। যখন তারাপদদার দরজা বরাবর এসেছি অমনি দরজা খুলে গেল, বৌদি চিৎকার করে উঠল, ভয়ে দৌড় দিলাম। সকলেই হেসে উঠল, একজন বৃদ্ধ বলল, তোর 'ঝুপি' কোথায়?

—পুকুরেই আছে।

কয়েকটা ছেলে তাকে ধরে রাখল। বাকি দু-চারজন গিয়ে ঝুপিটা তুলে আনল। নিতাই বলে দিল খেজুর গাছের সঙ্গে দড়িটা বাঁধা আছে।

ঝুপিটা নিয়ে এল ওরা। ঝুপি দেখেই দু-চার থাপ্পড় দিল উপস্থিত যুবকরা, নিতাই সহ্য করল—বৌ-চুরি চাপা পড়ে গেল, মাছ চুরির শাস্তি অতটা কঠিন হবে না। অনেকেই ঝুপি দেয়, 'ঝুপি' মানে লোহার তৈরি একগুচ্ছ বড় সাইজের বঁড়শির কাঁটা। ওতে জ্যান্ত মাছ গাঁথা থাকে। বড় সাইজের শোল, বোয়াল, চিতল জাতীয় শিকারি মাছগুলো ওকে গিলে ফেলার চেষ্টা করতেই—ঐ বঁড়শিতে গেঁথে যায়, টানাটানি করেও ছাড়াতে পারে না কারণ ঝুপির শক্ত গোড়াটা শক্ত শনের দড়ির সঙ্গে বাঁধা থাকে ডাঙ্গার একটা গাছের সঙ্গে। দড়ি ধরে টানতেই মাছটা উঠে আসতে বাধ্য। এ সব মাছ সাইজে বড়ই হয়। অনেকের 'ঝুপি'-র সাহায্যে মাছ ধরার নেশা থাকে, নিতাইয়েরও তাই ছিল।

সকলে বুঝে গেল ঝুপি যখন পাওয়া গেছে তখন নিতাইয়ের কথা সত্যিই বটে, তাকে আর কেউ কিছু বলল না—চলে যেতে বলল: ঝুপিটা কেড়ে নিয়ে পাড়ার ছেলেরা আমাদের দারোয়ানের কাছে জমা রেখে গেল পরের দিন বিচার হবে—নিতাইয়ের মাছ চুরির বিচার।

পরদিন বেলা ৮টার সময় নিতাইকে ধরে নিয়ে এল বাবার কাছে। বাবা বলল, নিতাই, সত্যি করে বল, আজ পর্যন্ত বড় পুকুরে কতগুলো মাছ ধরেছিস ঝুপি ফেলে?

—তা এককুড়ি হবে বাবু। সকলে হেসে উঠল। চোর তাহলে সত্যবাদী।

জানালা খুলে মা বলল, বুঝলে ও উপকারই করেছে। বড় বড় শোল, বোয়াল পুকুরে থাকলে চারাপোনা থাকে না। ভক্ত বলেছিল, ওড়ম্বাও বলে।

—তাই বলে চুরি করে ধরতে হবে? যদি সাপে কাটে রাতের অন্ধকারে?

—সে তো বটেই।

—এরপর দারোয়ানকে বলব রাতে ঘোরাফেরা করতে। এরপর যদি ধরা পড়িস থানায় পাঠাব—বুঝলি?

—না, আর ও কাজ করব না।

—ঠিক তো?

—হ্যাঁ বাবু।

ঝুপিটা আর ফিরে দিল না দারোয়ান। বলল, আর আসবে না, যাও।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে নিতাই চলে গেল। আসল মামলা থেকে সে রেহাই পেল, তাই মনে মনে খুশি। মাছ চোর তো পাড়ায় দশ-বিশটা পাওয়া যায়। ওটা এমন কিছু নয়। ঈশ্বরের দয়ায় এ যাত্রা সে বেঁচে গেল।

বাড়ি ফিরে সব ঘটনা শুনল তারাপদ। মনের কোণে এক সন্দেহ উঁকি মারছে, তথাপি বৌয়ের হাসি হাসি মুখ দেখে তারাপদ আমল দিল না কোন দুশ্চিন্তাকে।

মাস তিনেক পরে তারাপদ পুনরায় বারিপদায় যাওয়ার সুযোগে নিতাই ওর বৌকে নিয়ে নিখোঁজ হল। হৈ-চৈ সারা গ্রাম জুড়ে। সেদিনের সেই মাছ চুরিটা অভিনয় মাত্র। বেটা বাস্তু ঘুঘু। ঝুপি ফেলে মাছ ধরা একটা বাঁচার তাগিদ। সবই তার পূর্বকল্পিত। লোকে শুনে তাজ্জব বনে গেল। পাড়ার ছেলেরা থানায় ডায়েরি করে এল। তারাপদ ফিরলে যা হয় সে করবে।

কী আর করবে। খাঁচা ভেঙে উড়ে গেছে পাখি। পাড়ার সেই বৃদ্ধা মাসি মনমরা, কী করে পালালো সেটাই তার প্রশ্ন। একটুও টের পেল না? পাশেই সে শুয়েছিল।

অনেক সন্ধান করল তারাপদ। কোনও হদিসই মিলল না। গয়না-গাঁটি টাকাকড়ি সবই নিয়ে গেছে। মাস ছয়েক কেটেও গেল। একদিন তারাপদর শ্বশুর আমার জেঠতুতো দাদার কাছে এসে বিচার চাইল।

বাবা তখন দিনাজপুরে। কীসের বিচার? শারীরিক ক্রুটি ছিল তারাপদর। কেউ না জানুক তারাপদ নিশ্চয়ই জানত। সুতরাং তার বিয়ে করা কখনই উচিত হয়নি। অপরাধী সেই-ই।

—মেয়ের বয়স হয়েছে। আমি কি করে আটকিয়ে রাখি। এক বছর রেখেছিলাম ওদের মিটমাট করতে। জানাজানি হয়েছে অনেকদিন আগেই। তারাপদ চিকিৎসাও করিয়েছে। হয়নি কিছু। সুতরাং শুধু শুধু আমার মেয়ের দোষ দিলেই হবে না। আপনি অনুগ্রহ করে বিচার করুন।

—আপনি কি আপনার মেয়ের সন্ধান পেয়েছেন?

—পেয়েছি বাবু। তাই ভয়ে ভয়ে আপনার দারস্থ হলাম।

—কীভাবে সন্ধান পেলেন?

—চিঠি পেয়েছি। এই দেখুন চিঠি।

চিঠিটা পড়ে পকেটে রাখল দাদা। বলল, আজ রবিবার। পরের রবিবারে এই সময় আসবেন।

বৃদ্ধ চলে গেল।

পরদিন তারাপদকে ডেকে পাঠাল দাদা। প্রশ্ন করে তার কাছে অনেক কিছুই জানতে পারল। বিয়ের আগে থেকেই তার দৈহিক ক্রুটি ছিল একথাটা বেশ জোর দিয়েই আদায় করল দাদা।

একটু চুপ থেকে দাদা বলল, দারুণ অপরাধ করেছ তারাপদ। বিয়ের আগে ডাক্তার দেখিয়ে ফল যখন পেলে না তখন বিয়েতে পা বাড়ানো দারুণ অন্যায় হয়েছে। একটা মেয়ে সারা জীবন অশান্তিতে কাটাবে এটা কি হয়? কি হবে তোমার টাকা পয়সা গয়না-গাঁটিতে। তোমাকে পাঁচ দিন সময় দিলাম—যাকে খুশি তাকে বলে দেখ, তোমার অপরাধ অমার্জনীয় কি না। তাকে যদি কোনদিন পাওয়া যায় তাহলে তার শাস্তির পূর্বে তোমার শাস্তিই কঠিন হবে। হবে কিনা অন্তরঙ্গ বন্ধু-আত্মীয়দের কাছ থেকে যাচাই করে আমার সঙ্গে দেখা করবে। পাঁচদিনের মধ্যেই দেখা করা চাই।

—'আচ্ছা বাবু'—মন খারাপ করে উঠে গেল তারাপদ।

স্বাস্থ্য ভাল হলে হবে কি। সে নপুংসক। চিকিৎসা করলে কি হবে।

অনেকের সঙ্গে কথা বলে তারাপদ হতাশ হয়েছে। তার পক্ষে একটা ভোটও পড়েনি। পাঁচদিনের দিন অপরাধীর মতই হাজির হল তারাপদ।

দাদা শুনে বলল, তারাপদ এ নিয়ে বাড়াবাড়ি করলে তোমারই ক্ষতি হবে। যদি তাকে খুঁজে পাওয়া যায় তাহলে টাকা আর গয়না-গুলো ফেরত নিয়ে তুমি তাকে ছাড়পত্র লিখে দাও। আর তুমি কাকেও বিয়ে করো না। কেউই তোমার ঘর করবে না। তুমি মেয়ে হলে কখনই ওরকম স্বামীর ঘর করতে না।

অপরাধী তারাপদ ঘাড় নাড়ল। স্বীকার করল, তা ঠিক—নিজের দিয়ে বুঝতে হয়।

দাদা বলল, কত টাকা আর কতটা গয়না, ঠিক করে বল।

—শো পাঁচেক টাকা আর ভরি তিনেক গয়না।

—ঠিক আছে ফেরত দিতে বলব, যদি তাঁকে খুঁজে পাওয়া যায়। আর তুমিও ছাড়পত্র লিখে দিতে বাধ্য। কারও যুক্তিতে মামলা করলে বিপদ হবে তোমার। কোন্ হাকিম বলবে নপুংসক স্বামীর কাছে স্ত্রী থাকবে—বিশেষ করে এক বছর যখন সে তার বাপের বাড়িতে চলে গিয়েছিল—তখন তাকে ফিরিয়ে আনো কোন যুক্তিতে?

তারাপদ বলল, তখনই ভুল করেছি, যেমন করেছিলাম কাকেও না জেনে ঐ অবস্থায় বিয়ে ক'রে।

তাকে পেলে আমার গয়না, টাকা ফেরত দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন আমিও ছাড়পত্র লিখে দেব। কোনো মামলা টামলা করবো না।

—ঠিক তো?

—বাবু, ঠিকই বলছি। কারো কথা শুনব না।

—ঠিক আছে যেদিন ডেকে পাঠাবো এসে দেখা করবে।

পরের রবিবারে তারাপদর শ্বশুর এল।

দাদা বলল, তোমার মেয়েকে তোমার বাড়িতে আসতে বল। নিতাই

যেন না আসে। নিতাইকে যখন ডাকব তখন সে আসবে। এখন সরে থাকুক অন্যত্র। তবে ৫০০ টাকা আর গয়নাগুলো ফেরত এনে আমার কাছে জমা দেবে।

—আচ্ছা বাবু। আপনি বাঁচালেন। বৃদ্ধ পায়ে হাত দিতে চেষ্টা করল। পা সরিয়ে নিয়ে দাদা বলল, আপনি বয়স্ক লোক—আমাকে পাপে ডোবাবেন না। পায়ে হাত দিচ্ছেন কেন? আপনার অপরাধ কোথায়? যা বললাম তাই করুন।

বৃদ্ধ নমস্কার জানিয়ে চলে গেল। তিন চারদিন পরেই ওগুলো নিয়ে আসবে কথা দিল।

দিনের দিন এসে টাকা ও গয়না রেখে গেল। সপ্তাহ খানেক পরে বৃদ্ধকে পুনরায় আসতে বলল দাদা।

তারাপদকে ডাক করিয়ে তাকে সঙ্গে নিয়ে গেল কাটোয়াতে এক নামী উকিলের কাছে। ছাড়পত্রে সই সাবুদ হলে, উকিলের মাধ্যমে কোর্টে আবেদন জানানো হল। তার দাবি মত টাকা-গয়নাও আদালতে হাজির করা হল।

বিচারক শুনলেন না। উভয়কে কোর্টে হাজির হবার জন্যে আদেশ দিলেন।

দিনের দিন উভয়ের বক্তব্য শুনে এবং তারাপদকে জেরা করে জানতে পারলেন তার ভুলের দোষেই এটা ঘটেছে। প্রথম দু বছর খুব মনঃকষ্টেই ছিল তার স্ত্রী। এ কথা স্বীকার করার সঙ্গে সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদের আদেশ দিলেন বিচারক।

উপস্থিত ঝামেলা থেকে রেহাই পেল উভয়ে। পেল না শুধু নিতাই।

নিতাই তাকে নিয়ে পালিয়েছে কিনা এ প্রশ্নের উত্তরে মেয়েটা বার-বারই 'না' বলে এসেছে। তারাপদও এ বিষয়ে বিশেষ জিদ ধরেনি। সুতরাং নিতাই প্রসঙ্গ ধামাচাপাই পড়ে যায়।

মাস দুই পরে বাবা দিনাজপুর থেকে ফিরেছে খবর পেয়ে মেয়েটার বাবা দেখা করতে এল বাবার সঙ্গে। নিতাইয়ের দাদা পৃথক-অন্নে বাস করত বলে ভাইয়ের প্রসঙ্গে কোনো দায়িত্ব নিত না। সেজন্যে বাবা

নিতাইয়ের দাদাকে ডাকার প্রয়োজন নেই মনে করে মেয়ের বাবাকে ডেকে বলে, যদি তুমি নিতাইকে জামাতারূপে পেতে চাও অর্থাৎ তোমার মেয়ে যদি বিয়েতে রাজি থাকে তাহলে তুমি বিয়ে দিতে পার কারণ উভয়ের বয়স যখন চব্বিশ পঁচিশ তখন উভয়ের সম্মতিক্রমে বিয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু নিরাপদ ব্যবস্থা হল নিতাইকে ঘর-জামাইয়ে রাখা। এ গ্রামে যেন নিতাই ফিরে না আসে। লোকের মনের খবর তো বলা যায় না।

মনের মত বিচার পেয়ে বৃদ্ধ বারবার নমস্কার জানিয়ে হাসিমুখে চলে গেল।

আমার স্ত্রী কাহিনীটা শুনে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, সত্যিই ট্র্যাজেডি। শেষটা শান্তির কথাও বটে। শেষ দিনের অধিবেশনের জন্যে সকলেই উদ্‌গ্রীব। উৎকর্ণ সকলেই। সুযোগ মত শেষের দিনে আমি বলতে আরম্ভ করলাম।

হুগলি জেলার পাণ্ডুয়াতে আমার এক সহপাঠীর বাড়ি। বন্ধুটি চঞ্চল মস্তিষ্কের লোক। তার চালচলন ছেলেমিপনায় ভরপুর। মাঝে মাঝে বকাবকি করতাম—তবুও সে অস্থিরচিত্ত। ভাবনাচিন্তার বালাই ছিল না। কোনো দুঃখকষ্টকে তোয়াক্কা করত না। সমাজে এ ধরনের লোকও কিছু কিছু থাকে। বন্ধুটি ছিল বেশ অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে।

সে সময় আমি কোলকাতা হতে প্রকাশিত 'মাসিক আজাদ' পত্রিকার সম্পাদক। বন্ধুটির লেখালেখিতেও ঝোঁক ছিল। কবিতা লিখত। দু'একটা ভাল কবিতাও তার কলমের মুখ থেকে বেরুত। কয়েকটা আমার পত্রিকাতে ছেপেও দিয়েছিলাম। তাই মাঝে মাঝে পাণ্ডুয়া থেকে আমার কাছে কোলকাতায় আসত তার লেখা দিতে।

যতদূর মনে পড়ছে ১৯৫৬ সালের ঘটনা। পড়াশুনা শেষ করে আমার স্ত্রী এসেছে কোলকাতায় আমার কাছে স্থায়ীভাবে সংসার গড়তে। ফ্যামিলি নিয়ে তখন পার্ক সার্কাসে থাকি। বন্ধুটি বাসার ঠিকানা জেনেছিল আমার অফিসের কোনো কর্মীর কাছ থেকে। কিন্তু

বাসায় কোনদিন দেখা করতে আসত না। তার লেখাগুলো অফিসেই জমা দিয়ে চলে যেত। দু'তিন মাসের মধ্যে তার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎও হয়নি।

ঐ সময় আমি দিন কতক জ্বরে ভুগেছিলাম। প্রাইভেট ডাক্তারের সাহায্যে বাসাতেই চিকিৎসা চলছিল। সুস্থ হতে প্রায় পনের দিনের ধাক্কা। ইতিমধ্যে বন্ধুটি দু'একদিন অফিসে এসে আমার দেখা না পাওয়ায় আমাকে একটা পোষ্টকার্ড দেয় পাণ্ডুয়া থেকে। পোষ্টকার্ডটা লেখার সময় নিশ্চয়ই ওর স্ত্রী দেখেনি। তাহলে আর পোষ্ট করতে দিত না। ওর স্ত্রী শিক্ষিত, মার্জিত ও বিত্তশালী ঘরের মেয়ে। পাণ্ডুয়ার মাঠে পাখি শিকার করার জন্য বন্ধুটি দু'একবার আমাকে ওর বাড়ি নিয়ে গেছে। ভদ্রমহিলার আতিথেয়তায় আমি মুগ্ধ হয়েছি। এ হেন মহিলার বিড়ম্বিত ভাগ্যে জুটেছে একটা 'পাগল' স্বামী। 'পাগল' অর্থে বাচ্চাছেলের মত পাগলামিতে ভরা "সদানন্দ হতভাগা।" পোষ্টকার্ড না লিখে যদি একটা খামে লিখত তাহলে আমি বিড়ম্বনা থেকে বাঁচতাম। বন্ধুকে ধাপ্পা দিয়ে চিঠি দিলে নিশ্চয়ই সেটা খামে দেওয়া উচিত, এটুকু সাধারণ বুদ্ধিও তার ছিল না।

অসুস্থ শরীর নিয়ে সপ্তাহ দুয়েকের মত অফিসে যাইনি। সহ-সম্পাদক গোলাম মহম্মদ সাহেবই তখন পত্রিকার কাজ চালাচ্ছেন। বাসার ঠিকানায় বন্ধুবরের পোষ্টকার্ডটা এল। পোষ্টকার্ড নাহলে আমার স্ত্রী চিঠিখানা পড়তও না। মনে করেছিল অসুস্থতার খবর পেয়ে কাটোয়ার বাড়ি থেকে ভাইঝিরা লিখেছে। বন্ধু লেখাটা রপ্ত করেছে একটা বাচ্চা মেয়ের লেখার মত করে। এর জন্য তাকে তার উর্বর মস্তিষ্কের প্রভাব বিস্তার করতে হয়েছে। লেখার শেষে নামটাও দিয়েছে একটা মেয়ের। নামটা "রাবেয়া"। রাবেয়া নাম দেখেই চিঠিখানা আমার স্ত্রী পড়ে ফেলে। সঙ্গে সঙ্গে তার মাথায় যেন বজ্রাঘাত হয়। কারণ চিঠির বয়ান ছিল ঃ—

"তুমি কতদিন কোলকাতা গেছ। যাবার সময় মাত্র একশো টাকা

দিয়ে গেছ। তোমার মেয়েই বা কি খায় আমিই বা কি খাই, সত্বর টাকা পাঠাও।

ইতি
'রাবেয়া'

চিঠিখানা পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই ওকে শয্যাগ্রহণ করতে হয়েছে। আমি তখন পথ্য পেয়েছি। দিনের বেলাতেই ঘুমিয়ে পড়েছি। যাতে আমার ঘুম না ভাঙে সেদিকে খেয়াল রেখে চোখের জলে বালিশ ভিজিয়ে ফেলেছে। তার মনে সন্দেহ জেগেছে— দেশের বাড়িতে নিশ্চয়ই আমার প্রথম পক্ষের স্ত্রী আছে এবং তার একটা কন্যাও আছে। চিঠি পড়ে তো তা-ই বোঝা যায়। সুতরাং ভদ্রলোকবেশী সুদর্শন দেবকান্তি স্বামীটি একটা পাকা জুয়োচ্চোর, ধাপ্পাবাজ, মিথ্যুক।

পাঁচির দিকে তাকিয়ে বললাম সে সময় তোমার মা তেতে লাল হয়ে গেছে। স্ত্রীর মুখ পানে তাকিয়ে দেখলাম ছেলেদের সামনে মুখে হাত দিয়ে ফিক্ ফিক্ করে হাসছে। ছেলেরাও ছাড়ার পাত্র নয়, এমন কি স্বপন তপনও জিদ ধরল 'দিদা আপনার মুখে শুনতে চাই।' বাধা দিয়ে পাঁচি বলে চুপ কর্, তোরা 'দাদুকে বলতে দে।' আমি পুনরায় বলতে থাকি—'তপ্ত লৌহ শলাকার মতই তোমাদের দিদা' তখন আশপাশে ঘোরাফেরা করছে, গাত্রে কোনরকম স্পর্শ লাগলেই ফোস্কা অনিবার্য, সকলেই হেসে উঠল।

পত্রখান আমাকে দেখায়নি তখনও। চার পাঁচদিন মনমরা হয়ে আধপেটা খেয়ে বিনিদ্র রজনী অতিবাহিত করেছে। আমি রোগমুক্ত হচ্ছি—ওর পক্ষে আনন্দের কথা, কিন্তু ওকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন তীর্থের কাক।

(হো হো করে সকলের হাসি।) পাঁচদিন পর কাছে ডেকে ওর হাত ধরলাম, বললাম, কী ব্যাপার, মন খারাপ কেন ?

হাত ধরার সঙ্গে সঙ্গে ডুকরে কেঁদে উঠল। বলল, আমাকে আবার পাপে জড়ালে কেন ? তোমার স্ত্রী আছে, মেয়ে আছে, তাদের,

খেতে দিচ্ছ না, তারা অভুক্ত থাকলে অভিশাপ দেবে, দিচ্ছেও, তাতেই তোমার অসুখ-বিসুখ কাটছে না। একটা বৌ থাকতে তোমার মত তথাকথিত ভদ্রলোকের দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করা উচিত হয়নি। বলেই পাগলের মত কাঁদতে বসল।

কাঁদে আর বলে 'আমার আব্বার ভাগ্যই মন্দ। আমি তার কত আদরের একটা মেয়ে। আমার দিকে তাদের প্রাণ পড়ে আছে। এসব কথা শুনলে তাবা বাঁচবে না।—বলেই আবার কাঁদতে লাগল।

তারপর চোখের জল মুছতে মুছতে বলল,—তোমার স্ত্রী মেয়ে অভুক্ত। টাকা পাঠাওনি কেন? আজই মনিঅর্ডাব কর। তোমার পঙ্কিল জীবনের আবর্তে আমাকে পিষে মেরো না, দোহাই তোমার। বলেই আরও কাঁদতে লাগল।

মিথ্যা জিনিসটা সাময়িক যন্ত্রণা দেয়। আমি তা বিলক্ষণ জানি—তবুও প্রাণহানি ঘটার আশঙ্কা যেখানে, সেখানে অত্যন্ত সতর্কতাব সঙ্গে পা ফেলতে হয়। এ সব ব্যাপারে আমার কোনদিনই ধৈর্যচ্যুতি ঘটে না, কারণ আমি জানি সত্য একদিন প্রকাশ পাবেই এবং সেদিন দুর্যোগের মেঘ কেটে গিয়ে স্নিগ্ধ হাওয়ার পরশে আপ্লুত হবে সমস্ত দেহমন। স্বর্গীয় সুখ এখানেই।

অসুস্থ শরীরে খুব সাবধানে খাট থেকে নেমে আস্তে আস্তে ওর (স্ত্রীর) পাশে বসলাম। বললাম, এ সব কী আজগুবি স্বপ্নকে মনে স্থান দিচ্ছ। কে কী বলেছে—খুলে বল। মনে জানবে—এ সবের কোনো ভিত্তি নেই।

উন্নতগ্রীবা রাজহংসীর ন্যায় বক্র অথচ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে আমার প্রতি পলক হেনে বলে ফেলল, বেশ জোরের সঙ্গেই, সত্যিই কি এর কোনো ভিত্তি নেই? যদি প্রমাণ হয়?

—আত্মহত্যা করব।

—চমকে উঠল। তাতেও তো আমাকেই অপরাধী বানানো হবে।

—সুইসাইডাল নোটে সত্যি কথাই বলব। নিজের দোষ স্বীকার করে নেব।

ওর আরক্ত গণ্ডদ্বয় বেয়ে দু ফোটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ল। ধীর গতিতে আলমারি থেকে সযত্নে রক্ষিত সেই পোষ্টকার্ডটা বের করে দিয়ে বিছানায় মাথা রেখে আবার ডুকরে কেঁদে উঠল।

—পোষ্টকার্ডটায় ছাপমারা স্ট্যাম্পটা পড়া যাচ্ছিল। 'পাণ্ডুয়া'।

আমার আর হাসি ধরে না। অসুস্থ শরীরে অত দীর্ঘস্থায়ী হা-হা শব্দের হাসি শুনে সত্যিই ও অবাক হয়ে গেল। ভাবল—লোকটা ধরা পড়ে গিয়ে পাগল হয়ে গেল নাকি। স্ত্রী আছে, মেয়ে আছে—প্রমাণ হওয়ায় শেষটা পাগল হল?

আস্তে আস্তে উঠে গিয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে একটু আদর করে বললাম, যদি মিথ্যা প্রমাণ করতে পারি কি বকশিশ দেবে।

—আবার ধাপ্পা দিচ্ছ?

—যদি তুমি আমাকে প্রমাণ করার সুযোগ দাও। তাহলে আমরা শান্তি পাব। সংসারও ভাঙবে না।

—যদি প্রমাণ করতে না পার?

—কথা দিচ্ছি পি. আই. এ-র টিকিট (পাকিস্তান ইণ্টারন্যাশনাল এয়ারওয়েজ, তখন পূর্ব পাকিস্তান থেকে কোলকাতা আসত) কেটে তোমাকে উঠিয়ে দেব। তুমি বাপের বাড়ি পৌঁছে যাবে। এয়ারপোর্টে তোমার মামাই বড় অফিসার। আর জীবনে আমার কাছে ফিরে আসতে হবে না।

সে সময় ওর দীর্ঘশ্বাসটা লক্ষ্য করেছিলাম! এখন ও আমার সামনেই আছে—অথচ সেই দীর্ঘশ্বাসটা উভয়কে বেষ্টন করে ক্রূর হাসি হাসছে।

ওর সঙ্গে প্রমাণ করার অপেক্ষা পর্যন্ত আপোষ হয়ে গেল।

চিঠিখানায় রাবেয়া নাম দেখে প্রথমটা আমিও ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। পাণ্ডুয়া স্ট্যাম্প দেখে বুঝলাম শয়তানটাই একাজ করেছে। বাচ্চা মেয়ের মত হিজিবিজি লিখে একটা মেয়ের নাম দিয়ে পত্রখান ছেড়েছে, সবই তার পাগলামি। এ ধরনের লোকের অভাব নেই পৃথিবীতে। তাই তাকেও 'মানুষের মানচিত্রে' স্থান দিলাম।

পরদিন অফিস থেকে জব্বার নামের একটা ছোকরাকে পাণ্ডুয়া পাঠালাম বন্ধুর ঠিকানা লিখে দিয়ে। জব্বারকে শিখিয়ে দিলাম— আমি খুব অসুস্থ। এই মুহূর্তে যেন চলে আসে।

তার স্ত্রী এ সব ব্যাপার জানত না। শোনামাত্র সে তাকে পাঠালো জব্বাবের সঙ্গে। খামখেয়াল লোক। তার চিঠির কথা ভুলেই গেছে।

আসার সঙ্গে সঙ্গে তাকে বৈঠকখানায় বসিয়ে জব্বার ভিতরের ঘরে খবরটা পৌঁছে দিল। আমি অতি কষ্টে বৈঠকখানায় গেলাম। উভয়ের কি কথা হয় শোনার জন্য ও (স্ত্রী) পিছু পিছু এসে আমার পাশে দাঁড়িয়ে রইল। আমার স্ত্রীকে বললাম প্যাডটা দাও। বন্ধুটিকে বললাম পোষ্টকার্ডে যা লিখেছ—এই প্যাডে সেটাই লেখ। তোমার ঐ চিঠিটাকে ভিত্তি করেই আমার সোনার সংসার ভেঙে যাচ্ছিল। স্ত্রী আমাকে ছেড়ে জীবনের মত বাপের বাড়ি চলে যাচ্ছিল।

মনে হল বন্ধুটা স্বর্গ থেকে আচমকা পড়ে গেল, নিজেকে দারুণ অপরাধী মনে হতে তার প্রকৃত চেতনা ফিরে এল। কি থেকে কি হয়। সংসারে একটা অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ছোঁয়া লাগলে পুড়ে তছনছ হয়ে যায়। কথাটা আমিই বললাম।

সে প্যাডের ওপর ঐ কথাগুলো ঠিক সে রকমই ধবে ধরে লিখল, পোষ্টকার্ড দেখে সেই রকমের লেখা করতে তার আপ্রাণ চেষ্টা দেখে খুশিই হলাম। লেখাটা হুবহু মিলে গেল, স্ত্রীর হাতে পোষ্টকার্ড ও প্যাডটা দিয়ে বললাম—এই সেই 'রাবেয়া' আমার প্রথমা পত্নী। লেখাটা মিলে যেতেই যেন সিংহীমূর্তি ধারণ করে বন্ধুটাকে ছিঁড়ে ফেলার মত ঝাঁপিয়ে পড়ল। অসুস্থ শরীরে তাকে ঠেলতে ঠেলতে সিঁড়ির মুখে নামিয়ে দিলাম। তখন সে ওর পা ধরে ক্ষমা চাইতে ব্যগ্র। বললাম তুমি এখন যাও। এ বাড়িতে কখনও এস না।

ওর রণরঙ্গিনী মূর্তি দেখে মনে হল খাটের তলায় লুকোই। ও আমাকে ওয়ার্নিং দিল—এ সব বন্ধুকে যেন পদাঘাত করে দূর করি।

—কথা দিলাম, ওর সঙ্গে বাক্যালাপ বন্ধ করলাম আজ থেকে।

...সর্বভূতেষু স্ত্রীরূপেণ...বলতেই স্বপন ও তপন লাফ দিয়ে উঠল।

সমস্ত অধিবেশনের সমাপ্তি ঐ দিনেই। কারণ পরদিন কোলকাতা ফেরার পালা।

পরদিন সকাল থেকেই সকলকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে চোখের জলে ভাসিয়ে কোলকাতা ফিরলাম সপরিবারে। শুধু হাসি ফুটে উঠল পাঁচির মুখে। অর্থাৎ পাঁচিকে সঙ্গে করে কোলকাতা নিয়ে এলাম। আমার স্ত্রী তার ধর্মমেয়ে-পাঁচিকে ছেড়ে আসবে না, জানিয়ে রেখেছিল আগে থেকেই।

পাঁচিকে কয়েক সপ্তাহ ধরে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কোলকাতার যাবতীয় দর্শনীয় জায়গাগুলো দেখালাম। সে মুগ্ধ, আত্মহারা। আমার স্ত্রী খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সবকিছুর বর্ণনা করে তাকে শোনাতো। কয়েক দিন পর করসেবাকে কেন্দ্র করে বাবরি মসজিদ ধূলিসাৎ করল মৌলবাদীরা। সঙ্গে সঙ্গে বাংলা বন্‌ধ ডাকা হল। পরের দিন ভারত বন্‌ধ হল। মসজিদ ভাঙাকে উপলক্ষ্য করে সারা ভারতব্যাপী সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা শুরু হল। সর্বত্র কার্ফু জারি হল। সেনা নামানো হল। তবুও অগ্নি সংযোগ, খুনখারাবি চলল এবং পরে বোঝা গেল ওটা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় পরিণত হল মৌলবাদীদের পূর্ব পরিকল্পিত মসজিদ ভাঙাকে কেন্দ্র করে। অতি দ্রুত এ দাঙ্গাকে রোধ করা সম্ভব হল সরকারের সঙ্গে জনসাধারণের সহযোগিতার ফলেই।

দ্বিজাতি-তত্ত্বের পটভূমিতেই ভারত দ্বিখণ্ডিত হয়ে স্বাধীনতা লাভ করে। বিদেশী শাসকের কূটকৌশলই এর জন্য মূলত দায়ী। তৎসত্ত্বেও বলা যায়, উপমহাদেশের ধান্দাবাজ স্বার্থান্ধ রাজনীতিবিদদের কার্যকলাপও সমভাবে দায়ী। স্বাধীনতা লাভের প্রাক্কালে যুদ্ধপীড়িত ও মূল্যবৃদ্ধিতে নিষ্পেষিত সাধারণ মানুষ যখন জর্জরিত ঠিক তখনই রাজ-নীতির পঙ্কিল আবর্তে নিরীহ দরিদ্র জনসাধারণকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দেশত্যাগে বাধ্য করায় ঐ সব স্বার্থান্ধ রাজনীতিবিদরা। বাঁচার তাগিদে উভয় সম্প্রদায়ের মানুষকেই নারকীয় যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। নেতৃ-বৃন্দের অদূরদর্শিতার মোক্ষম ফলস্বরূপ আজও সমভাবেই নিপীড়িত হতে হচ্ছে উপমহাদেশের আপামর নিরীহ জনসাধারণকে যদিও প্রায় অর্ধ

শতাব্দীর কাছাকাছি আমরা স্বাধীনতা লাভ করেছি।

সম্প্রদায়গত বিভেদকে প্রশ্রয় দিয়ে আসছে উভয় সম্প্রদায়ের মৌলবাদী ধান্দাবাজরা। যদিও প্রকৃত অর্থে এঁরা বকধার্মিক। শাসন-ক্ষমতা কব্জা করার ভণ্ডামিতে এঁরা মুখোশধারী ধার্মিক।

যুগ যুগ ধরে বর্ণবিদ্বেষের করাল ছায়া বিশ্ববাসীকে তিলেতিলে গ্রাস করে আসছিল। বিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে এসে তা অনেকখানি ধুয়ে মুছে গেছে। কিন্তু আমাদের এই উপমহাদেশে হিন্দু-মুসলিমের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে ধর্মান্ধ মৌলবাদীরা দেশটাকে রসাতলের দিকে ঠেলে দিচ্ছে অজ্ঞতায় অন্ধকারে ডুবে থাকা জনসাধারণকে তুরুপের তাস সাজিয়ে।

বাবরি মসজিদ-রাম জন্মভূমি দ্বন্দ্বে মৌলবাদীদের চক্রান্তে বাবরি মসজিদ ধূলিসাৎ হল। ঐ সঙ্গে জাতি বিদ্বেষ ও ধর্ম বিদ্বেষ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠার সুযোগ পেল। সাম্প্রদায়িকতার প্রেক্ষিতে মৌলবাদীদের তাণ্ডব নৃত্যে বহু জীবন নষ্ট হল। নিরপরাধ ব্যক্তিরা হল আশ্রয়হীন—কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি নষ্ট হল। এর জন্য দায়ী ব্যক্তিদের কঠোর শাস্তিই কাম্য—যে শাস্তি হবে নজিরবিহীন।

দেশকে মধ্যযুগীয় বর্বরতার পর্যায়ে টেনে নামানো হল। এতে কী ধর্ম রক্ষা হল? ধর্মের সংজ্ঞা কী? অপর ধর্মের ক্ষতিসাধন করে নিজ ধর্মের গৌরববৃদ্ধি করার মত নির্বুদ্ধিতা এই বৈজ্ঞানিক যুগে থাকা উচিত কি?

যা সৎকর্ম—তাই-ই ধর্ম। অসৎ কর্মের দ্বারা ধর্ম রক্ষা পেতে পারে না। পরমতসহিষ্ণুতা ধর্মের বিশেষ অঙ্গ। জিঘাংসা-প্রবৃত্তি সৎকর্মের অঙ্গীকৃত হতে পারে কী?

সহনশীলতা ধার্মিকের লক্ষণ তথা ধর্মের স্বরূপ। প্রকৃত ধর্মের জয়-যাত্রা শান্তির পথকে অবলম্বন করে। সকল সম্প্রদায়ের মানুষের লক্ষ্য হওয়া উচিত শান্তি, সম্প্রীতি ও সংহতি। সংহতির মধ্যেই স্ব স্ব ধর্মের সেবা করা যেতে পারে। তাছাড়া ষড় রিপুকে সংযত রাখাই ধর্মের মূলমন্ত্র। অন্যায়কে প্রশ্রয় দিয়ে যেমন ন্যায়ের সন্ধান করা নির্বুদ্ধিতা,

ধর্মও ঠিক তাই, যেখানে অধর্ম সেখানে ধর্মের প্রস্থান।

বিশ্বের উন্নতশীল দেশগুলো যখন সৃষ্টিরহস্য ভেদ করে মঙ্গলগ্রহে পাড়ি দেওয়ার চেষ্টা করছে, আমরা তখন মসজিদ-মন্দির ধ্বংসের দিকে মেতে উঠেছি। এর জন্য যারা দায়ী তাদের সমূলে বিনাশ না করলে আমরা উভয় সম্প্রদায় ধ্বংসের স্তূপে পরিণত হব।

বাবরি মসজিদ ধ্বংসের পর নানা গুজব রটনা করা হল। মৌলবাদীরাই এর জন্য দায়ী। কত মন্দির-মসজিদ ভাঙার ফিরিস্তি শোনা গেল। কিন্তু দেখা গেল, হিন্দুর মন্দির রক্ষা করতে মুসলিম ভাইরা প্রাণদানে উদ্বুদ্ধ এবং মসজিদ রক্ষার জন্য হিন্দু ভাইরাও প্রাণ বিসর্জন দিতেও কুণ্ঠিত নয়। প্রতিবেশী মুসলিম রাষ্ট্রের মন্দির রক্ষার তৎপরতা ও শান্তি মিছিলের হিড়িক যেমন, ভারতের মসজিদ রক্ষা ও শান্তি মিছিলের বন্যাও বয়ে যাচ্ছে আজও প্রতিটি শহরেই। এটা বড়ই আশার কথা, আনন্দের কথা যে, মানুষ ধর্মকে ভিত্তি করে আর অহেতুক হানাহানি, রক্ত ক্ষয় করতে চায় না। এখন উভয় সম্প্রদায়ের সমাজ-সচেতন মানুষ মৌলবাদীদের বিরুদ্ধে এককাট্টা। অচিরে এই পশুশক্তির বিনাশ অপরিহার্য। মৌলবাদীরাই প্রগতির অন্তরায়, এদের কঠোরহস্তে দমন করার জন্য আপামর জনসাধারণকে সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে হবে। প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে শান্তি বজায় রেখে পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগের সুযোগ করে নিতে হবে নিজেদের, তবেই আমরা এযুগের প্রগতিশীল মানুষের সমপর্যায়ভুক্ত বলে দাবি করতে পারব। যে সমস্ত রাষ্ট্র সার্কগোষ্ঠীভুক্ত, তাদের উচিত স্ব স্ব এলাকায় সংখ্যালঘুদের ওপর যে সমস্ত দুর্বৃত্ত অত্যাচার চালাবে তাদের সম্পত্তি এবং যাদের নির্দেশে অত্যাচার ঘটে তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেই যতটা সম্ভব ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা, তাহলে স্বার্থে আঘাতজনিত হুঁশিয়ারিতে তারা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ধন, মান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ধ্বংসের জন্য উদ্যোগী না হতে সচেষ্ট থাকবে।

তাছাড়া সকল সম্প্রদায়ের নাগরিককে সম্প্রীতির মানব-শৃঙ্খলায় আবদ্ধ করতে সরকারি উদ্যোগ থাকা চাই। প্রাথমিক শিক্ষা স্তর থেকেই সম্প্রীতির পাঠ থাকা বাঞ্ছনীয়।

*   *   *

মাসতিনেক আগে বিদ্যাসাগর সেতুর (দ্বিতীয় হুগলী সেতু) উদ্বোধন করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরসিংহ রাও। এশিয়ার শ্রেষ্ঠ সেতু দেখিয়ে ফেরার পথে আমার স্ত্রী ও পাঁচিকে বললাম—শুনেছি রাবণ রাজা স্বর্গে যাবার জন্যে সিঁড়ি তৈরি করেছিলেন। সে সিঁড়ি দেখার সৌভাগ্য আমাদের কারোরই হয়নি। তবে যে সেতুটা আজ দেখলাম—এটা এক স্বর্গ থেকে আর এক স্বর্গে যাওয়ার মতই সেতু বটে। ওরা কথাটার তাৎপর্য ঠিক বুঝল না। বাসায় ফিরে স্ত্রীকে নির্জনে একাকী পেয়ে বুঝিয়ে দিলাম মানুষের মানচিত্রখানা তুমি যদি খুলে দেখ তাহলে প্রদীপের নিচে অন্ধকার দেখবে। বিদ্যাসাগর সেতুর সৌন্দর্য অভিনব, স্বর্গীয় সুষমায় মণ্ডিত—এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু রবীন্দ্র সেতুর (হাওড়া ব্রিজ) নিচের ঝুপড়িবাসীদের দৈনন্দিন জীবন-সংগ্রামের ছবিটাও তুমি মানচিত্র থেকে মুছে দিতে পার না—পার না ফুলবাগান থানার পার্শ্ববর্তী ঝুপড়িসহ হাজার হাজার ঝুপড়িবাসীদের নারকীয় কাহিনী অস্বীকার করতে। লক্ষ লক্ষ নেহারবানু ফুটে উঠছে মানুষের মানচিত্রে। আমি 'সিটি অফ জয়'-এর পরিবর্তে 'সিটি অফ 'ক্ষয়'-এর কথাই বলছি। এটাই আজকের প্রতিপাদ্য বিষয়।

কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য পৃথিবী ছাড়ার সময় বলে গেলেন ··

'অবাক পৃথিবী ! অবাক করলে তুমি !
জন্মেই দেখি ক্ষুব্ধ স্বদেশভূমি।

*   *   *

এদেশে জন্মে পদাঘাতই শুধু পেলাম,
অবাক পৃথিবী ! সেলাম, তোমাকে সেলাম !'

আমি তাঁর আত্মাকে আশ্বস্ত করে বলতে চাই—মানুষের মানচিত্রে একদিন ফুটে উঠবে·· ···

"পদাঘাতের বদলা নিতে,
পদাঘাতই দিলাম।"

॥ সমাপ্ত ॥